পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৬১

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ও অঙ্গবিন্যাস
দেবাশিস দেব

মুদ্রক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২, বিডন রো
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ওয়েলনোন্ প্রিন্টার্স
রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৯

উপন্যাসগুলির রহস্যসূত্র ঃ

মোহিতবিতানের সেইদিন

মোহিতবিতান বড় অদ্ভুত গ্রাম। গ্রামটার যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ হয় চোরের ওপর বাটপাড়ির পয়সায়। একজন নৃশংসভাবে খুন হতে তদন্তে নামে এক কিশোর। আবিষ্কৃত হয় মাটির নীচে গুমঘরে রাখা গুপ্তধন। তারপর.......

বেড়াল

মফঃস্বলে রহস্যঘন এক পরিবেশে জনাকয়েক তরুণী এক মহিলার কঙ্কালের সঙ্গে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে থাকা বেশ কয়েকটা মৃত বেড়াল আবিষ্কার করে বসল। কিছুদিন পর বিচিত্র এক যুবক তার বেড়ালের দল নিয়ে আক্রমণ করল তাদের বাড়ি........

নায়িকা সুদূর

চরম দেহবাদী নায়িকা, সমকামী প্রযোর্জিকা আর ফুলের মত নিষ্পাপ এক কিশোরীর সান্নিধ্যে এসে ভাল হতে শেখে ধুরন্ধর এক যুবক। পুজোর দিনগুলোতে প্রেমের ফুল ফোটে তার জীবনে। সে ভুলতে চায় তার বিশেষ এক বন্ধুর মাকে.........

ভোরের প্রথম আলো উঁকি দিতেই ঘুম ভেঙে গেল বাপনের। খাটের ওপর থেকেই দেখা যাচ্ছে, থোকা থোকা কুয়াশার নীচে মুখ গোমড়া করে থাকা পুকুরটা বাড়ির বাহির-মহলের প্রায় গায়ে এসে ঠেকেছে। দু'দুটো মার্কারি ভেপার ফ্লাড লাইটের আলোয় তার জল রুপোর মত চকচক্ করছে। শরীরটা বালিশের ওপরে সামান্য উঁচিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল বাপন, বিন্দু বিন্দু আলোর নীচে জলের ওপর ছোট ছোট জমাট অন্ধকার। মাছেদের দল খেলা করছে। কিছুদিন আগেই পুকুরে বেড়জাল ফেলেছে দাদু। মাছেদের শরীরের ওপর জমাট ময়লা ওতে কেটে যায়। এছাড়া দু'দুটো কেজি পাঁচেকের কাৎলাও রাখা হয়েছে জলে।

অন্য মাছকে নিয়মমাফিক তাড়া করবে। এতেও নাকি স্বাস্থ্য ক্রমশ ভাল হয়ে যাবে ওদের......ভাতের পাতে বসে বাবা বলবেন, আরে! এযে দেখছি মাখন.....শুধু তেল বেরোচ্ছে; খুব দৌড়ঝাঁপ করেছে ব্যাটারা যা হোক!

এ'রকম ভোরবেলা ভীষণ ভাল লাগে বাগানের। কী সুন্দর টুসটুস্ করে শিশিরেরা কার্পেট তৈরি করেছে। মাঝে মাঝে রামধনুর সাতটা রঙ যেন ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে তার থেকে। আর সুগন্ধ! সমস্ত বাগান, পুকুর থেকে এক অপার্থিব গন্ধ ভেসে আসছে। এসব যেন বাপন এমনিতেই

অনুভব করে, আর দাদু বলেন, স্বর্গীয় সুষমা ঘিরে রয়েছে আমাদের বাড়িকে। কথাগুলো একটু ভারী হলেও বুঝে নিতে কষ্ট হয় না বাপনের। আজকাল প্রচুর বইপত্র পড়ছে ও। সেসব ঘাঁটলে এমনিতেই সব জানা যায়।

আলোর সুইচগুলো অফ্ করতেই এক ঝলক হাড় কন্‌কন্ করা ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে এল। শীতের ছুটিতে দাদুর বাড়ির সবকিছুই ধীরে ধীরে সুন্দর হয়ে উঠছে। সদর দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসার সময় বাপন দেখতে পেল এই সাত সকালেই বাড়ির মালি অধীরদা দাদুর

বাতিল করা একটা পুরনো ঢলঢলে সোয়েটার গায়ে দিয়ে মরসুমী ফুলের গাছগুলোর পরিচর্যায় লেগে পড়েছে।

জিনিয়া, ক্যালেণ্ডুলা, পিটুনিয়া, কার্নেশান, হলিহল, কসমস। নামগুলো অধীরদার কাছে শুনতে শুনতে বাপনের এখন মুখস্থ হয়ে গেছে। সবই মরসুমী ফুল। পুকুরের দু'পাশ ঘিরে তাদের রঙিন উপনিবেশ তৈরি হয়েছে....আর থেকে থেকে অসংখ্য গাঁদা ফুলের গাছ। একেকটা বেশ বড়। এ'রম খুব বড় একটা গাঁদাফুল গাছের গোড়ায় পড়ে থাকতে দেখে সেটা তুলে নিয়ে তাকে উপহার দিয়ে বাবা বলেছিলেন, এটার নাম কি জানিস ?——আফ্রিকান জায়ান্ট। বাপন দেখেছিল, ফুলটার কয়েক গুচ্ছ পাপড়ি ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেলেও তখনও আশ্চর্য রকমের সতেজ দেখাচ্ছে সেটাকে।

ফি-বছর কালীপুজো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা-মা'র সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে দাদুর কাছে চলে আসে বাপন। কলকাতা থেকে মাত্র ঘন্টা চারেকের তফাতেই একটা ছবির মত সুন্দর গ্রামে থাকেন দাদু। ভি.আই.পি. রোডের ধার থেকে বাসে বিধাননগর, আর সেখান থেকে ট্রেন, তারপর যথাসময়ে সেটা থেকে নেমে পায়ে টানা ভ্যানে চাপলেই দাদুর বাড়ি। ভ্যানগুলোর ওপর ক্রমাগত মানুষ চাপার ফলে বেশ কয়েকটা মানচিত্রের মত দাগ পড়ে গেছে। মোট যে ছ'খানা ভ্যান দাদুর গ্রাম থেকে স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করে তার সবকটার ওপরই একটা ছাল ওঠা তেলতেলে হলদেটে দাগ দেখেছে বাপন।

ভ্যানগুলো যাত্রী বোঝাই অবস্থায় যে রাস্তাটা ধরে গ্রামে ঢোকে তার দুপাশে প্রাচীন বট, অশ্বত্থ আর নারকেল গাছের সারি যেন দুটো কৃত্রিম দেয়াল তৈরি করে রেখেছে। তাদের মাঝখানের যে রাস্তাটা ধরে গত পরশু বাপনেরা এখানে এসেছে তেমন কোন রাস্তা সে এজন্মে অন্য কোথাও দেখেনি। দাদুর ভাষায়, রক্তমৃত্তিকা এ রাস্তার প্রাণ, আর তাকে সৌন্দর্য্য দিয়েছে এখানকার গাছপালা।

দাদুর বাড়ির পুকুরটা কেন্দ্র করে কয়েক পাক দিতে না দিতেই পরিপূর্ণ সকাল হয়ে গেল। বিরাট ফ্রেঞ্চ উইন্‌ডোগুলোর একটার পাল্লা

খুলে মা মুখ বাড়াতেই বাপন নীচ থেকে চেঁচিয়ে বলল, মা, আজ লুচি আর আলু-ফুলকপির তরকারি...... ।

মা একগাল হেসে বললেন, তুই তাহলে দৌড়ে দুলালের দোকান থেকে ক'টা জিলিপি নিয়ে আয়। তোর বাবা তো নেই.....এখন তুই-ই ভরসা।

দুলালদার হাতের জিলিপি যেন সত্যিই অমৃত। গরম অবস্থায় খেলে তার থেকে ভাল কোনও খাবার পৃথিবীতে আদৌ আছে কিনা ভাবতেই

সন্দেহ হয়।

মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই দুলালের দোকানের দিকেই ছুটল বাপন।

রোদের সঙ্গে সঙ্গে শীতটাও বোধহয় জাঁকিয়ে পড়ছে। বিছানা থেকে নামার সময় স্লিপিং স্যুটটা বদলে একটা গোলগলার বড় হাতার গেঞ্জি

চড়িয়ে নিয়েছিল ও। দেখা গেল শীতের গুঁতোর কাছে সেটা আর একটা হাফ্ প্যান্ট একদম নস্যি।

দু'হাতের চেটো ঘষতে ঘষতে যথাসম্ভব জোরে দৌড়বার চেষ্টা করছিল বাপন। গ্রামের সবকিছুই কেমন দূরে দূরে। মিনিট সাতেক একটানা দৌড়বার পরও মনে হচ্ছে দোকানটায় পৌঁছতে আরও খানিকটা সময় লেগে যাবে।

নদীর চড়ার পর হঠাৎই যেখানে জমিটা বেশ কয়েক হাত উঁচু হয়ে উঠেছে সেখানে একটা বিরাট কাঁঠালগাছের গা ঘেঁষে দুলালের দোকান। বাপন যখন হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে গিয়ে পৌঁছল তখন দুলাল কড়ার গরম তেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিলিপির লেই ছাড়ছে। বাপনকে দেখে একগাল হেসে সে বলল, আজ এত সকাল সকাল চলে এলে যে, এই সবে দু'কিস্তি চলছে।

বাপন দোকানের পাশের বেঞ্চিটায় ধপাস্ করে বসে পড়ে বলল, আজ বড্ড ভোরবেলা উঠে পড়েছি.....কিন্তু ফার্স্ট কিস্তিরটা কে খেল ?

দুলাল ডানহাতের শানচা দিয়ে ফুটন্ত তেলের ভেতর টগ্‌বগ্ করতে থাকা জিলিপিগুলো তুলে তেল ঝরিয়ে পরিষ্কার একটা তেল রসের ডেকচির ভেতর ফেলল, তারপর বাঁ হাত দিয়ে নদীর পাড়ের দিকটা দেখিয়ে বলল, ঐ যে ওরা।......দেখ, এখনও খাচ্ছে।

বাপন পাশ ফিরে দেখল, বাঁ দিকে বেশ খানিকটা তফাতে একগাদা ঝোপঝাড়ের আড়ালে বাঁশ চিরে পেরেক লাগিয়ে আরেকখানা বেঞ্চির মত জিনিস খাড়া করা হয়েছে। নদীমুখো বসানো সেই বেঞ্চিটায় তিনটে লোক বসে আছে। এখান থেকে লোকগুলোর পেছন দিকটুকুই কেবল দেখতে পাচ্ছে বাপন। তবে লোকগুলোর প্রত্যেকের হাতেই নিশ্চয়ই জিলিপির ঠোঙা রয়েছে। আরেকটু এগিয়েই বাপন দেখতে পেল, খুব মনোযোগ দিয়ে জিলিপি চিবুচ্ছে ওরা। আর ঠোঙার সাইজ কী একেকটা! মনে হয় মাত্র তিনজনেই এক ঝুড়ি জিলিপি সাফ করার ব্রত নিয়ে জোরকদমে ময়দানে নেমে পড়েছে।

খানিকক্ষণ আরও দেখার ইচ্ছে হচ্ছিল বাপনের। লোকগুলোকে

কেমন একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। পোষাক-পরিচ্ছদগুলো ঠিক এখানকার লোকেদের মত নয়। তিনজনেই নীল জিন্‌স পরেছে। প্যারালাল। গায়ে স্কিন টাইট কালো লেদার জ্যাকেট। পায়ে নামী এক কোম্পানীর স্পোর্টস্‌ শু। যেন নদীর দিকে তাকিয়ে আছে এ'রম একটা ভাব নিয়ে আড়চোখে লোকগুলোকে দেখছিল বাপন, এমন সময় দুলাল ডাকল।

ভাপটুকু যাতে বেরিয়ে না যায় সেজন্য জিলিপিগুলো সুন্দরভাবে বড়

একটা ঠোঙায় প্যাক করে দিয়েছে দুলাল। একটা বড় পলিথিনের প্যাকেটে সেটাকে ঢুকিয়ে যে প্রশ্নটা সে করল তাতে একটু অবাক হয়ে গেল বাপন।

—লোকগুলো কি তোমার দাদুর ওখানে উঠেছে?

—কই না তো! এদের তো দেখিনি কোনওদিন! বাপন বলল।

দুলালকে একটু চিন্তিত দেখাল। বলল, ভোরবেলায় এসেছে আমার দোকানে। বলল, বামুনপাড়ায় কোন বাগানবাড়িতে এসে উঠেছে।.....আমি ভাবলাম, বোধহয় তোমার দাদুর ওখানে.....অতবড় বাগানবাড়ি যখন—

—হরষিতদাদের বাড়িতে না তো? ওদেরও তো বিরাট বাড়ি.....

—সে তো পোড়ো বাড়ি! হরষিত যে কী করে ওখানে থাকে! কিন্তু, এরা কি ওখানে উঠবে?

—তুমি জানো না, আমি তো পাঁচিল ডিঙিয়ে ওদের কলা বাগানে প্রায়ই ঢুকি—আমি নিজে দেখেছি বাড়ির পেছন দিকটা অনেকটা সারানো হয়ে গেছে।

—কবে সারানো হল বলতো? বাপনের মনে হল দুলালকে কেন জানি একটু সতর্ক মনে হচ্ছে।

—এরা থাকলে নিশ্চয়ই এদেরই লোক সারিয়ে টারিয়ে রেখেছে। দাদুকে জিজ্ঞেস করলেই ঠিক জানা যাবে।

—একটু জিজ্ঞেস করতো, আমার এদের লোক সুবিধের মনে হচ্ছে না।

লোকগুলোকে আর এক ঝলক দেখে বাপনেরও মনে হল, কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলেনি দুলালদা। তিনজনের কারো স্বাস্থ্যই ঠিক সাধারণ না। বেশ ঘাড়ে গর্দানে চেহারা, তদনুপাতেই লম্বা। মুশকিলটা হচ্ছে ওদের কারোরই মুখ দেখতে পাচ্ছে না বাপন। সেটা দেখতে হলে ওকে লোকগুলোর সামনে যেতে হবে। তবে, সেটার আর দরকার হল না। বাপন দেখল, ঠোঙাগুলোকে বলের মত পাকিয়ে ওদের একজন নদীর চড়ার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রুমালে আঙুল মুছতে মুছতে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

দোকানের সামনে আসার পর যতটা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব লোকটার দিকে তাকাল বাপন। হাইটটা নিশ্চই এর ছ'ফিটেরও বেশি। কদমছাঁট চুল আর দাড়ির জঙ্গলের আশেপাশে রোদেপোড়া মুখের রঙ লালচে

বাদামি, আর চোখদুটো ঠিক যেন মরা মাছের মত সাড়হীন। বাপন দেখল, দুলাল কেমন ভ্যাবলার মত লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

নদী শিবপদেব দিকে

লোকটা যেন ওদের দেখতেই পাচ্ছে না এমন একটা ভঙ্গি করে হিপ পকেট থেকে একটা ওয়ালেট বার করে তার থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট নিয়ে দুলালের দিকে বাড়িয়ে দিল।

খুচরো টাকাটা ফেরৎ নিয়ে পকেটে ভরার সময়ও একটাও শব্দ খরচ করল না লোকটা। শুধু তার বিরাট চেহারাটা যখন চোখের সামনে থেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল তখন রুগ্ন চেহারার দুলাল বলে উঠল, দিব্যি মোষের মত চেহারাটি! কিন্তু, আমি হলফ করে বলছি বাপন ভাই, এরা সুবিধের নয়।

দুলালের কথায় বাপনের হাসি পেয়ে গেল। কোনওমতে সেটা চেপে সে জিজ্ঞেস করল, কেমন করে বুঝলে?

—জ্যাকেটের ভেতরটা কেমন উঁচু হয়ে রয়েছে দেখলে না.....ওখানেই তো নল্‌চেটা গোঁজা।

—নল্‌চে!

—নল্‌চে, নল্‌চে.....রিভলবার গো। হিন্দি সিনেমায় দেখনি?

—আমি হিন্দি সিনেমা দেখি না। কিন্তু বুকের যেখানে রিভলবার ঢুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে সেটাকে তো হোলস্টার বলে। একটা চামড়ার খাপে....

আর বলা হল না বাপনের। তার আগেই একটা বিকট আর্ত চিৎকার ভেসে এল নদীর দিক থেকে। চিৎকারটা এমনই ভয়ানক যে বাপনের মনে রইল না, এই সবেমাত্র সকাল হয়েছে...চারদিকে পাখি ডাকছে। মুহূর্তে গলা দিয়ে এক শীতল ভয়ের শিহরণ উঠে এসে তাকে স্তব্ধ করে দিল। দুলাল কিন্তু চিৎকারটা কানে আসা মাত্রেই কড়াটা ফেলে দৌড়তে শুরু করেছে। অগত্যা বাপনও তার পেছনে ছুটতে শুরু করল।

নদীর পাড়ে এসে যা দেখল তা কোনও দিনও ভুলতে পারবে না বাপন। নৌকো থেকে নেমে বালির চড়া পেরিয়ে উঁচু জমিতে উঠে আসার জন্য যে কয়েকটা তক্তা এখানকার মানুষেরা লাগিয়ে রেখেছেন তারই একটার পাশে বুকের ওপর একটা হাত চেপে কাটা পাঁঠার মত গড়াগড়ি খাচ্ছেন একজন মানুষ। বেশ দামি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ়। তার বুকের একটা অংশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। দুলাল এক লাফে চড়ার ওপর লাফিয়ে পড়ে দু'হাতে লোকটাকে বসিয়ে দেওয়ার শেষ চেষ্টা করল। বাপন দেখতে পেল, লোকটার বুকের ডানদিকে কালো একটা গর্ত। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে সেটার থেকে।

দারুণভাবে শ্বাস পড়ছে মানুষটার। দুলালকে দু'হাতে আঁকড়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলছেন উনি। তারপর হঠাৎই তার হাতদুটো খুলে গেল। শরীরটা বেতের ছড়ির মত দড়াম করে বালির ওপর ছিটকে পড়ে একেবারে স্থির হয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম কোনও মানুষকে চোখের সামনে মরতে দেখল বাপন। সমস্ত শরীরটা তার একবার শিউরে উঠল। তারপরই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

॥ ২ ॥

বাপনের দাদু সন্তোষবাবুর বিরাট ড্রইংরুমটার একটা সোফায় বসে দু'হাতের ভেতর নিজের মাথাটা ধরে নানান কথা চিন্তা করছিল হরষিত।

তার বয়স গেল শ্রাবণে পঁচিশ পেরিয়েছে। উচ্চতায় খুব বেশি না হলেও শরীরটা পোক্ত। সন্তোষবাবুর বাগানের পাশেই তার বাড়ি। এমনিতে সেটার জরাজীর্ণ অবস্থা। কিন্তু পুজোর সময় জ্যাঠামশাই যখন তাকে মেস থেকে গ্রামের বাড়িতে চলে আসতে লিখলেন তখন একটু ধন্দেই পড়ে গেছিল সে। কি এমন ব্যাপার যার জন্য জ্যাঠামশাই অমনভাবে লিখলেন! তবে কী নিজের পরিণতির কথা জ্যাঠামশাই আগেই টের পেয়েছিলেন? ছেলেবেলা থেকে সে বাবা-মাকে দেখেনি। গ্রামের এই বাড়িতে চাকর-বাকর পাড়া-প্রতিবেশীরাই তাকে অনেকটা বড় করে তুলেছে। এজন্য অবশ্য অকৃতদার জ্যাঠামশাই-ই দায়ী। ভাইপোর জন্য চেষ্টার কসুর করেননি তিনি। গ্রামের স্কুল থেকে শহরের বোর্ডিং পর্যন্ত তিনিই টেনেছিলেন। কোনওরকম অভাব দূরে থাক, রীতিমত স্বচ্ছন্দেই কেটেছে তার জীবন। যদিও কোনওদিনও সে জ্যাঠামশাইয়ের উপার্জনের রাস্তাটার খোঁজ পায়নি।

হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পর ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে যখন বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হল তখন থেকেই ও কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ঘোরাঘুরি করত। এভাবেই আর বই পড়ার নেশাটা থেকেই প্রুফ দেখার কাজটা ও নিজের পেশা করে নিয়েছিল। সেই সময়টা থেকে জ্যাঠামশাই গোয়াবাগানের একটা মেসে ওর থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেন। ক্রমশ জ্যাঠামশাইয়ের আসা যাওয়াটা কমে এল। একটা মোটা অঙ্কের হাত খরচ আর মেসের যাবতীয় খরচা অবশ্য বরাবরই তিনি মাসের তিন তারিখের ভেতর মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিতেন। বি.এ পাশ করার পরও বছর চারেক একইভাবে চলছিল। একটা সংবাদ সাপ্তাহিকের প্রুফ দেখা ছাড়াও টুক্‌টাক্ লেখালেখি বাবদ যে পয়সা আসত তার সবটাই জমে যেত হরষিতের।

এই বিরাট পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষে এক ঐ জ্যাঠামশাই ছাড়া আর কেউই ছিল না হরষিতের। স্রেফ পুরনো কিছু বন্ধুর জন্য ওর মেসটা ছাড়ার ইচ্ছে ছিল না। ভদ্র, সংযত হরষিতের ওপর বন্ধু-বান্ধবেরও আস্থা ছিল যথেষ্ট। এইসময়ই অকস্মাৎ চিঠিটা এল। কোনওদিনও তাকে চিঠি লেখেন না জ্যাঠামশাই। সে অভ্যাসই নেই তার। তাই ভীষণ আশ্চর্য লেগেছিল হরষিতের। খুব তাড়াতাড়ি তাকে গ্রামের বাড়িতে ফিরতে লিখেছিলেন জ্যাঠামশাই। হরষিতও আর দেরি করেনি। গ্রামের বাড়ির

কথা সে প্রায় ভুলতে বসেছে। এই সুযোগে না হয় ক'দিন বেশ ঘুরে আসা যাবে—এমনই একটা চিন্তা থেকে সে রওনা দিয়েছিল।

কিন্তু এখানে এসে নিজের সেই পুরনো বাড়িটায় পা দিয়েই অবাক হয়ে পড়েছে হরষিত। বাইরেটা একরকম দেখালেও ভেতরে আমূল পরিবর্তন এসে গেছে। গোটাচারেক ঘর। দারুণভাবে আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো লিভিং রুমটা সুন্দর কার্পেট আর ওয়াল পেপার মোড়া। সেখানে একেবারে হালফিলের মডেলের একটা টিভি সেট আর টেলিফোন। ব্ল্যাক মার্বেল আর টাইল ব্যবহার করা হয়েছে কিচেনে। এছাড়া এক্সহস্ট ফ্যান। সব দেখেশুনে বিস্ময়ের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে হরষিত। জ্যাঠামশাই তাহলে এখানে পাকাপাকিভাবে থাকার উপযোগী সমস্ত ব্যবস্থাপত্তর আগেই করে রেখেছেন। অথচ চিঠিটা পাবার আগে পর্যন্ত সে এসবের আভাসটুকু পর্যন্ত পায়নি। একটু ক্ষোভই হয়েছিল হরষিতের। সেটা আরো বেড়ে গিয়েছিল লাইব্রেরি রুমের সাইজ দেখে। কমপক্ষে চারশো স্কোয়ারফিটের একেকটা দেয়াল জুড়ে শুধু বই আর বই। কাঠের প্যানেলের ভেতর সুন্দরভাবে সাজানো সবকটা বইই রেক্সিনে বাঁধানো। সামনে একটা বিপুল সাইজের সেক্রেটারিয়েট টেবিল। হরষিত বুঝল, প্রুফ রিডারের চাকরিটা এবার তার গেল। এই ঘরটা দেখার পর কলকাতায় ফেরার আর কোনও মানে হয় না। কিন্তু এক মাসের ওপর অপেক্ষা করার পরও জ্যাঠামশাই যখন এলেন না তখন একটু দুশ্চিন্তায় পড়ল হরষিত। একটা বছর জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বলতে গেলে দেখাই হয়নি। এবারও যদি দেখা না হয়?—তবে দেখা হল ঠিকই। জ্যাঠামশাই এই এতদিন বাদে ফিরে এলেন—আজই সকালে, এক মৃতদেহ হিসেবে।

ভাবনার জালে আপাদমস্তক জড়িয়ে পড়ছিল হরষিত। আজই সকালবেলায় তার একমাত্র শ্রদ্ধার এবং সম্ভবত তার ভালমন্দ ভাবারও প্রথম এবং সর্বশেষ মানুষটিকে কেউ নৃশংসভাবে গুলি করে মেরেছে। গুলিটা খুব কাছে থেকেই করা হয়েছে অথচ অকুস্থলের কাছাকাছি উপস্থিত ক্লাস সিক্সের একটা ছেলে এবং জনৈক দোকানদার কোন বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পায়নি। সম্ভবত সাইলেন্সার লাগানো ছিল

রিভলবারে। ব্যালাস্টিক এক্সপার্টদের রিপোর্ট না পেলে অবশ্য কোনও ছবিই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে না।

দরজার কাছ থেকে খুট্ করে একটা শব্দ হল। হরষিতের আচ্ছন্ন ভাবটা হঠাৎই কেটে গেল তাতে। মুখ তুলতেই সে দেখতে পেল দরজার কবাটে একটা হাত রেখে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন বাপনের দাদু সন্তোষবাবু। পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি আর বেতের ছড়ি হাতে টুকটুকে ফর্সা সন্তোষবাবুকে যে কোনও পরিস্থিতিতে সবারই ভাল লেগে যায়। হরষিতেরও লাগল। সকালবেলায় অজ্ঞান অবস্থায় থাকা বাপনকে কোলে নিয়ে দুলাল যখন বাড়িতে ঢুকল সন্তোষবাবু তখন লুঙ্গি পরে দাঁতন হাতে বাগানে ঘুরে ঘুরে দাঁত মাজছিলেন। সে সময় পাড়ার আরও কয়েকজনের মতই দৌড়ে ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য সে এ বাড়িতে এসে ঢুকেছিল। কিন্তু তার পরের ঘটনা জানতে পেরে মাথার ওপর যেন বজ্রপাত হয়েছিল হরষিতের। তার জ্যাঠামশাইকে দুলাল চেনে একেবারে ছেলেবেলা থেকে। মাঝে বছর কয়েকের অদর্শন সত্ত্বেও তাকে চিনতে কোনও অসুবিধে হয়নি দুলালের। এছাড়া শেষ মুহূর্তে তাকেই তো তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন।

দুলালের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা শোনার পর মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল হরষিতের। এই ছোট্ট গ্রাম মোহিতবিতানে সবাই তার জ্যাঠামশাই তৃষিত লাহিড়ীর মত মানুষকে, যিনি হঠাৎই বছর কয়েকের জন্য উধাও হয়ে যান আবার হঠাৎই ফিরে আসেন, তার রহস্যময়তার জন্যই মনে রাখবে এটা স্বাভাবিক। এছাড়া বছর কয়েক আগে গোটাকতক রাজনৈতিক হত্যার পর তিনিই প্রথম মানুষ যিনি স্বগ্রামের মাটিতে এভাবে খুন হলেন। দুলাল হরষিতের কানের কাছে গোটাকতক শব্দ উচ্চারণ করেছিল। মাত্র তিনটে শব্দ। মৃত্যুর ঠিক আগে তৃষিতবাবু তার কানের কাছে এটুকুই শুধু বলতে পেরেছিলেন।—গুমঘর......হরষিত......টাকা। প্রথম শব্দটার অর্থ দুলাল ধরতে পারেনি। হরষিত নিজেও ধন্দে পড়ে গেল। যাইহোক, শব্দ তিনটেকে মনের পকেটে পুরে সে যখন নদীর পাড়ে এসে পৌঁছল পুলিশ তখন লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য কাপড়ে বেঁধে একটা ভ্যানরিক্সায় তুলছে। একেবারে নারকীয় পদ্ধতিতে কাজকর্ম চলছে। তবুও হরষিতকে জনৈক

সাব ইন্সপেক্টারের সঙ্গে আরেকটা পায়ে টানা ভ্যানে মাইলখানেক দূরে থানা পর্যন্ত গিয়ে সইসাবুদ করে আইনের দিকটা দেখতে হল। তখনও পর্যন্ত সন্দেহভাজন লোকেদের তালিকায় সে-ই সবার আগে। কিন্তু সেটা ধোপে টিকল না। হরষিতের পাড়ার এক গণ্ডা বন্ধু-বান্ধব একবাক্যে জানিয়ে দিল, ঘন্টাখানেক আগে পর্যন্তও হরষিত সমেত তারা সবাই দাঁতন হাতে চণ্ডীমণ্ডপের পাশে তেঁতুলতলায় একসঙ্গে আড্ডা দিয়েছে এবং এক মুহূর্তের জন্যও কেউ সেখান থেকে ওঠেনি।

অতঃপর দুলাল তার এজাহারে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, খুনটা সে প্রায় তার চোখের সামনে হতে দেখেছে আর দেখেছে সন্তোষবাবুর নাতি বাপন। সকালবেলায় জিলিপি খেতে আসা সন্দেহজনক ঐ তিনটে লোকের যথাসম্ভব বিবরণও সে দিল।

ইন্সপেক্টার সুজিত ঘোষ তখন একটা মোটা চুরুট হাতে এই সাত সকালেই সেটাকে ধোঁয়া করে ফেলা স্বাস্থ্যকর হবে কিনা ভাবছিলেন। এতক্ষণ যা তিনি শুনেছেন তা থেকে একটা সিদ্ধান্তেই আসা যায়——খুনটা হরষিত বা দুলাল এদের দুজনের কেউই করেনি। একজনকে দেখে বোঝাই যায়, এ লাইন ওর জন্য নয়, আর আরেকজনের কচুরি-জিলিপির বাইরে কোনও বৃহত্তর ভাবনা আছে বলে অন্তত মুখ দেখে মনে হয় না। এখানেই বৃত্তটা ছোট হয়ে এল এবং আরও কঠিন হল। ঐ তিনজন সন্দেহভাজন লোককে দেখেছে কেবল দুলাল আর সন্তোষবাবুর নাতি। নাতিটি উপস্থিত অজ্ঞান। জ্ঞান ফিরলে আরও কিছু জানা যেতে পারে। বদমাইশগুলো নির্ঘাত সাইলেন্সর লাগানো রিভলবার থেকে গুলি চালিয়েই গাছপালার আড়াল দিয়ে দৌড়ে অন্য কোনও গ্রামে ঢুকে গেছে এবং ঈশ্বরের সদিচ্ছা তাদের দিকে থাকলে হয়ত এতক্ষণে যে যার ঘাঁটিতেও পৌঁছে গেছে। মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দুলালের মাথায় এসব হয়ত আসেওনি। কিন্তু, খুনটা হল কেন? অ্যাঁ!

মুহূর্তে চুরুটটা ফেলে দিয়ে সিধে হয়ে বসলেন সুজিতবাবু। আজ সকাল থেকেই ছোটখাটো অথচ মারাত্মক কিছু ভুল হচ্ছে তার। এ নিশ্চয়ই গতরাতের সেই বিদ্ঘুটে স্বপ্নটার জন্য!

শেষরাতে যখন ঘুমটা জবরভাবে এসেছে ঠিক সেই ব্রাহ্মমুহূর্তেই স্বপ্নটা এল। সুজিতবাবু দেখলেন, একটা বিশাল ডাইনিং টেবিলে জনাদশেক কনস্টেবল আর সাব ইন্সপেক্টার ইদ্রিস আলিকে নিয়ে তিনি খেতে বসেছেন আর সামনে টেবিলের ওপর একটা আস্ত হাতিকে ভেজে রাখা হয়েছে। একেবারে গদার মত দাঁত আর ছালটাল সমেত। হাতিটার সমস্ত শরীর এমনকি ছোট্ট লেজটা থেকেও অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এমন সময় ইদ্রিস আলি এক আঙুল লম্বা ফল খাওয়ার একটা কাঁচা চামচে হাতে লাফিয়ে উঠে বলল, আমি টেংরি দুটো খাব, আমি টেংরি দুটো খাব। চারপায়ের ভেতর কোন দুটো টেংরি বোঝার আগেই সুজিতবাবু দেখলেন হাতিটা আড়মোড়া ভেঙে সামনের দুটো পা শূন্যে তুলে অবিকল মানুষের মত একটা হাই তুলল, তারপর কুতকুতে চোখে বিরাগপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার ইদ্রিসের দিকে তাকিয়ে সম্ভবত তাকে পছন্দ না হওয়ায় নিজের কড়া করে ভাজা শুঁড়টা সোজা সুজিতবাবুর মুখে পুরে দিল। সেটা একমনে চিবোতে চিবোতেই সুজিতবাবু অনুভব করলেন, তিনি যেটা চিবোচ্ছেন আসলে সেটা তার নিজের পাশ বালিশটারই একটা কোনা। এই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমভাঙা এবং সেটার মাধ্যমে দুম্ করে বাস্তবে নেমে আসার ব্যাপারটা এই এতখানি বেলা পর্যন্তও কাটিয়ে উঠতে পারেননি সুজিতবাবু।

স্বপ্নটার কথা ভেবেই খানিকটা লজ্জা আর রাগে মুখখানায় বিলিতি বেগুনের মত রঙ ধরছিল সুজিতবাবুর। সেটা দেখে গ্রামের লোকজনের ধারণা হল, আসামীরা কেটে পড়ায় সাহেব বেজায় চটেছেন। অতএব, ভিড়টা আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল। হরষিতও তখন ফিরে এসেছিল। ফেরার পথে একটু ইতস্তত করে সন্তোষবাবুর দো মহলা প্রাসাদের মত বিরাট বাড়িটার মেইন গেট দিয়ে ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল সে।

—কী এত ভাবছ হরষিত? তার কাঁধে হাত রেখে প্রশ্নটা করেছেন সন্তোষবাবু। এক ঝটকায় বাস্তবে ফিরে এল হরষিত। ক্লান্তভাবে সে জিজ্ঞেস করল, বাপনের জ্ঞান ফিরেছে, দাদু?

—রমেশ মৌলিককে তো দেখেছ। আমাদের হাউস ফিজিশিয়ান।

উনি একটু আগে বললেন, আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যাচ্ছে। বিড়বিড় করে কি যেন বলবারও চেষ্টা করছে। প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কার কারণেই নাকি এ'রম অবস্থা। তবে সিরিয়াস কিছুর আশঙ্কা নেই। তুমি বরং বাবা একবার সন্ধ্যের দিকে এস। আমার মনে হয় তখন ও কথাটথা বলতে পারবে, আর....., একটু ইতস্তত করলেন সন্তোষবাবু, আমারও কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে——তোমার জ্যাঠামশাইয়ের বিষয়ে।

হরষিত বলল, আপনাকে তো জ্যাঠামশাই দাদার মত দেখতেন——

——তার চেয়েও বেশি......আমাদের দুজনের একটা দল ছিল.....তোমার জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু আজ সেই দলটা ভেঙে দিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সন্তোষবাবু। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল হরষিত।

॥ ৩ ॥

সারা দুপুর ও বিকেল অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় কাটিয়ে সন্ধের একটু আগে আবার সন্তোষবাবুর বাড়ির ড্রইংরুমে এসে ঢুকল হরষিত। বাড়ির ভেতর থেকে একটা সোরগোল কানে ভেসে আসছে। বোধহয় বাপন সুস্থ হয়ে ওঠায় ঠাকুর, চাকর সকলে মিলে তাকে আরো চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে। বাস্তবিকই ছেলেটা ভারি অন্যরকমের। নরম মনের, কল্পনাপ্রবণ অথচ গায়ে বেশ জোর আছে। দাদুর কাছে বেড়াতে এলেই দিনে অন্তত তিনটে ঢাউস বই ও তার লাইব্রেরি থেকে নেবে এমন একটা কথা ছেলেটা কালকেই বলেছে। এমনই সময় জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুটা ওর অপরিণত মনে একটা আঘাত দিয়ে গেল। কিন্তু হরষিত অসহায়। দুলাল ছাড়া বাপনই ঘটনার এমন এক সাক্ষী যার স্মৃতির ওপর সে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারে।

বেশিক্ষণ বসে থাকতে হল না তাকে। ছোকরামত একজন চাকর এসে খবর দিল, দাদু আপনাকে ভেতরে ডেকেছেন।

শোওয়ার ঘরে একটা বিশাল পালঙ্কের ওপর একটা ঢাউস বালিশে পিঠ দিয়ে বেশ প্রফুল্লমুখে সোজা হয়ে বসেছিল বাপন। তার চোখমুখের

উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছে। হরষিত এসে দেখল, ঘরে বাপন ছাড়া তার মা আর সন্তোষবাবু এই দুটিমাত্র প্রাণী রয়েছেন। তাকে দেখা মাত্রই বাপনের মা তাকে বললেন, বস হরষিত। আমি তোমার জন্য জলখাবার নিয়ে আসছি।

আজ সকাল থেকেই খিদেবোধ ব্যাপারটাই লুপ্ত হয়ে গেছে হরষিতের। সে বলল, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার খিদে নেই। আপনি বরং আমাকে এক কাপ কড়া কালো কফি দিন।

বাপনের মা ঘর থেকে বেরোতেই সন্তোষবাবু বললেন, একদিকে ভালই হল, বল। একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ মেয়ের সামনে আর আওড়াতে হল না।

——অপ্রিয় প্রসঙ্গ। একটু বিস্ময়বোধ করল হরষিত।

——অপ্রিয় অবশ্যই। ভয়ংকরও বটে। তুমি বরং আগে বাপনকে জিজ্ঞেস করে যা জানার সব জেনে নাও।

বাপনকে জিজ্ঞেস করে অবশ্য ঘটনার একটা তুলনামূলক পরিচ্ছন্ন বিবরণ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল হরষিতের। সে বলল, আচ্ছা, মারা যাওয়ার সময় আমার জ্যাঠামশাই দুলালকে কিছু বলে গেছিলেন, কি বলেছিলেন তুমি জান ?

——কই না তো! জ্ঞান হবার পর তো দুলালদার সাথে আমার কোনও কথা হয়নি।

——তাই বটে। হরষিত মাথা নিচু করে কথাটা স্বীকার করে নিল।

সন্তোষবাবু তির্যক দৃষ্টিতে হরষিতের মুখের দিকটা লক্ষ্য করছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, তুমি কি একবার আমার সঙ্গে পাশের ঘরে আসবে ?

হরষিত দেখল বাপনের চোখ ততক্ষণে বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা একটা বাঁধানো বইয়ের দিকে চলে গেছে। বইটা বেশ মোটা। বোধহয় কোনও কমিকস। তার লাইব্রেরির নয়। সন্তোষবাবুর দিকে ফিরে সে বলল, চলুন তাহলে.......।

সন্তোষবাবু খাটের গায়ে হেলান দেয়া তার হাতির দাঁতে বাঁধানো লাঠিখানা তুলে নিলেন।

সন্তোষবাবু তাকে আজ যে ঘরখানায় নিয়ে এলেন সেটায় এর আগে কোনওদিন আসেনি হরষিত। তার বাড়ির লাগোয়া, উঁচু দেয়ালটার এপাশে এই বিরাট লম্বা হলঘরটা সম্বন্ধে জানবার উৎসাহ তার ছেলেবেলা থেকেই ছিল, কিন্তু, সুযোগটা এল এতদিন পর।

ছোকরা চাকরটা এসে এর ভেতরই ধূমায়িত দু'কাপ কফি রেখে গেছে।

কফি খেতে খেতে একটা অদ্ভুত চিন্তা বারবার হরষিতের মনে পাক খেয়ে যাচ্ছিল। সে যেন একটা বিরাট খাঁচার ভেতর বন্দী। অথচ আপাতদৃষ্টিতে দিব্যি দেখাচ্ছে ঘরখানাকে। চারদিক দিয়েই আলো বাতাস আসার ব্যবস্থা রয়েছে' ঘরের ভেতর দিক থেকে মাত্র একখানাই দরজা। কিন্তু, বিরাট সাইজের চারটে জানলা খান কয়েক দরজার অভাব পুরোপুরি পুষিয়ে দিয়েছে।

সন্তোষবাবু যেন হরষিতকে একমনে পড়ছিলেন। বললেন, দুপুরে যে কথাটা বলব বলে তোমাকে ডেকেছিলাম সেটা বলার সময় এখন হয়েছে। দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখত কেউ ঘাপটি মেরে রয়েছে কিনা।

এই হেঁয়ালির মাথামুণ্ডু কিছুই ধরতে পারছিল না হরষিত, তবু বৃদ্ধের, সন্দেহভঞ্জনার্থে একবার উঠতেই হল।......না, কেউই নেই দরজার পাশে।

——তুমি হয়ত ভাবছ যে আমি তোমাকে কি এমন বলতে যাচ্ছি যার জন্য এমন নাটক করছি। আসলে এর অনেক কারণ আছে, যার সূত্রপাত হয়েছিল আজ থেকে বহু বছর আগে। তোমাদের আর আমাদের পরিবারের ভেতর একটা অলিখিত বোঝাপড়ার ব্যাপার ছিল। বিষয়টা ছিল——একটা ব্যবসা। এ'রকম কোনও ব্যবসার কথা কেউ কখনও কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে আমরা উভয়পক্ষই পেরেছিলাম।

দারুণ উত্তেজনা অনুভব করছিল হরষিত। সন্তোষবাবু কথায় কিসের যেন লুকোনো এক ইঙ্গিত।

সন্তোষবাবু বললেন, একটু ভূমিকার অবতারণা করতেই হচ্ছে, কারণ আমার আর তোমার জ্যাঠামশাইয়ের পেশার কথাটা তুমি ভালভাবে নিতে পারবে না। হয়ত.....

একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল হরষিত। সে বলল, আপনি বলেই ফেলুন, দাদু। আমি কিছু মনে করব না।

—'গ্রন্থিচ্ছেদক' কথাটার মানে জানো?

হরষিত ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠলি। বলল, 'তস্করের ভ্রাতা গ্রন্থিচ্ছেদক' প্রবচনটার কথা শুনেছি।

—হ্যাঁ, সেই। সাদা বাংলায় 'গ্রন্থিচ্ছেদক' মানে 'গাঁটকাটা'। আমি আর তৃষিত ছিলাম তাই।

—অ্যাঁ! হরষিত কি বলবে ভেবে পেল না। এই সুন্দর সদাহাস্যময় সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ নিজেকে গাঁটকাটা বলছেন, আর সঙ্গে জড়িয়ে নিচ্ছেন তার একান্ত শ্রদ্ধার মানুষটিকেও!

—আমি তো আগেই বললাম এটা মেনে নিতে তোমার কষ্ট হবে। তাহলেও এটাই সত্যি। এবং কেবল এই-ই নয়। এটা তোমাদের আর আমাদের পরিবারের রক্তে গত তিরিশ বছর ধরে রয়েছে। আমরা সত্যিই অন্যের চুরি করা জিনিস গায়ের জোরে দখল করে নিই, আর সে টাকা নানান কাজে লাগাই।

—কিন্তু এতো অন্যায়, ভয়ানক ব্যাপার। জঘন্য এসব কাজ—

—থামো হে! এই বামুনপাড়া, কৈতর্ব্যপাড়া এখানে কিভাবে তৈরি হয়েছে জানো?

—না, কিভাবে?

—আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি এই দুটো পাড়া। আমি নিজে, আর তৃষিত। এই দুটো পাড়ার প্রত্যেকটা পরিবারে ছড়িয়ে আছে আমাদের অসংখ্য লোক। দুলালও তাদের একজন জানবে। এদের জন্য বিগত কুড়ি-পঁচিশ বছর কি না করেছি আমরা দুজন। মাসের পর মাস পড়ে

থেকেছি পাহাড়ে, জঙ্গলে, অচেনা অজানা সব জায়গায়। ঘুরেছি শহরের পর শহর। কোথায় কোন জায়গায় কার ঘাঁটি, কোথায় টাকা ভাগাভাগি হয়। পুরনো কোন জায়গায় কার ঘাঁটি, কোথায় টাকা ভাগাভাগি হয়। পুরনো মন্দির, শ্মশান, রেল ইয়ার্ড, নদীর তীর, হাইওয়ের পাশে, দুর্দান্তভাবে সাজানো ফ্ল্যাটবাড়ি আর হোটেলের কামরার ভেতর—সব জায়গায় আমরা খুঁজে পেয়েছি অসংখ্য অপরাধীকে। টিপে মেরেছি প্রত্যেকটাকে আর মালপত্র হাপিশ করে দিয়েছি। টাকায় মানুষের ঠিকানা লেখা থাকে না। তবু সামান্য যে সব জিনিসপত্র থাকত তা থেকে যদি এমন কোনও মানুষের সন্ধান পাওয়া যেত খোয়া যাওয়া টাকাটা যার জীবনমৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে, ভালভাবে খোঁজখবর করে একমাত্র তার টাকাই আমরা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে, আজ পর্যন্ত এমন মাত্র চারজন মানুষকেই আমরা খুঁজে পেয়েছি।

শুনতে শুনতে আতঙ্কমিশ্রিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে উঠছিল হরষিত। কোনওরকমে সে বলল, তাহলে আপনি বলতে চান যে সব সাধারণ চোর ডাকাতদের কথা আমরা শুনি তাদের নিয়ে আপনাদের কোনও মাথাব্যথা ছিল না।

—একেবারেই না। সাধারণ চুরি ডাকাতির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কাজকর্মের পেছনে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ দারিদ্র ছাড়া আর কিছুই নেই। এরা কোনওকালেই আমাদের লক্ষ্য ছিল না। আমরা বধ করতাম তাদের, যারা কোনও না কোনও বড় কেলেঙ্কারীর অংশীদার। সাম্প্রদায়িক হানাহানি থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা পর্যন্ত যাদের যাতায়াত। এরা যে দেশের কতবড় শত্রু তা একবারও ভেবে দেখছ, হরষিত ?

—তা হোক। আপনি আর জ্যাঠামশাই এমন সব কাজ কারবারের ভাগীদার, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না, দাদু।

বিষণ্ণভাবে হাসলেন সন্তোষবাবু। বললেন, তা তো বলবেই। একবারও কি ভেবে দেখেছ এই যে এত বড়টা হলে এর পেছনে তোমার 'গাঁটকাটা' জ্যাঠামশাইয়ের কতটা অবদান ? ভেবেছ কি দিনের পর দিন বনবাদাড়ে পড়ে থেকেও সময়মত তোমার প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা কি করে তিনি

যথাসময়ে পৌঁছে দিতেন? তোমার অসুবিধের থেকেও ও নিজের মৃত্যুকে শ্রেয় বলে মনে করেছে। এতটার হয়ত কোনও দরকার ছিল না, কিন্তু তোমার বাবা-মায়ের মৃত্যুর জন্য ও সর্বদাই নিজেকে দায়ী বলে মনে করত বলেই এতসব ও করেছে।

একটা তীব্র উৎকণ্ঠা হরষিতের ওপর যেন চেপে বসছিল। কোনমতে সে বলল, বাবা মা'ও কি...... ?

——হ্যাঁ, হ্যাঁ। যেন ক্ষুব্ধ হুংকার দিয়ে উঠলেন সন্তোষবাবু, এখানকার আর সবাইয়ের মত তারাও ছিলেন আমাদের সহকর্মী। একটা জরুরি অপারেশানের সময়, অন্য আরেক গ্যাং-এর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ওদের দুজনই মারা পড়েন।

——কোথায়? হরষিত শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করতে পারল।

——ছোটনাগপুরের একটা জায়গায়। এখন লোকে হাওয়া বদলাতে ওখানে যায়।........তৃষিত ওর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে সে সময় খানিকটা দূরে অন্য আর একটা জায়গায় ব্যস্ত না থাকলে সেদিন এমন ঘটে না......কিছুতেই না।.....এই একটাই আফশোষ ছিল তৃষিতের। এই যে তুমি কাগজের লাইনে গিয়ে ঢুকলে.....আর পড়াশোনা করলে না, এটা ওকে খুব আঘাত দিয়েছিল। আমাকে বারকয়েক ও বলেও ছিল, হরষিতকে মানুষ করার ব্যাপারে কি আমার কোনও খুঁত থেকে গেল, সন্তোষদা? নইলে, ও চাকরী করতে ঢুকল কেন?

মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইল হরষিত। প্রথম থেকে সবকিছু সে মনে মনে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কী অদ্ভুত জায়গায় সে এতদিন বাস করছে। কোন এক বিরাট চক্রের মধ্যমণির সামনে বসে রয়েছে সে। দেখলে মনে হবে প্রায় সত্তর ছুঁইছুঁই——গীতাপাঠ আর সাবেকি ব্যাপারে ডুবে থাকা এক বৃদ্ধ। আর জ্যাঠামশাই! তাকে দেখলে খুব ভাল স্বাস্থ্যের উচ্চাকাঙ্খী কোনও শ্রমিক ছাড়া অন্য কিছু বলে মনেই হত না। যে পুকুর, বাগান আর পাড়াগুলো মিলে তার ছেলেবেলার লুকোচুরি, গাদি খেলে বেড়ানো——সেগুলো আসলে লুকোন উদ্দেশ্যে

তৈরি করা কতগুলো পেছিয়ে পড়া মানুষের কলোনী যাদের ইষ্টদেবতা সন্তোষবাবু আর তার জ্যাঠামশাই তৃষিত লাহিড়ী। তাদের টিপিক্যাল কাজকর্মে এরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সন্তোষবাবু আর জ্যাঠামশাইয়ের ছিনিয়ে নেওয়া টাকায় এখানে হয়ত স্কুল, চাষবাস এমনকি যাবতীয় ব্যবসাও চলছে। গত সপ্তাহে সে স্টেশনের গায়ের ধানক্ষেতটায় যে তিনটে পাওয়ার টিলার দেখে এল সেগুলোও হয়ত এভাবেই এসেছে।

মাথা ভোঁ ভোঁ করে উঠল হরষিতের। কী অসাধারণ সংগঠন। দুই থেকে কুড়ি, তার থেকে দুশো। অর্থাৎ এর মৃত্যু নেই। হরষিত মানসচক্ষে দেখতে পেল, সন্তোষবাবু যতই বলুন না কেন আসলে এ দল আর ভাঙবার নয়। এরপর এই দুটো পাড়া থেকে তারা গোটা গ্রাম,গ্রাম থেকে শহর, মাকড়সার জালের মত সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। আর তার হেডকোয়ার্টার হবে সন্তোষবাবুর এই বাড়ি। শহরে লুকোন কোন জায়গায় মোবাইলল ফোন, কম্পিউটার আর টিভির জঙ্গলে বসে সে তার অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে লক্ষ্য করে যাবে এই বিশাল ভারতবর্ষের কে, কোথায় অকস্মাৎ অসাধু উপায়ে কোটি কোটি টাকা ছিনিয়ে নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে সব লুটে নিয়ে আসবে তারা। ভাগ করে দেবে সমস্ত দরিদ্র মানুষদের। এভাবে তারাও অপরকে নিজেদের ভাগ দেবে——ঠিক যেন একটা সুন্দর সাইকেলের পিচ ঢালা রাস্তার ওপর অবাধ এগিয়ে চলা।

নিজের চিন্তাভাবনার গতিপ্রকৃতি নিজেই অবাক হয়ে গেল হরষিত। ইতিমধ্যেই তার মন থেকে যাবতীয় দুঃখ কষ্টের অনুভূতি লোপ পেয়েছে। তার বদলে এখন সেখানে জন্ম নিচ্ছে অপূর্ব সমস্ত ইচ্ছে।

সন্তোষবাবু একদৃষ্টিতে হরষিতকে লক্ষ্য করছিলেন। আজ পর্যন্ত তার নির্বাচনে কোথাও ভুল হয়নি। তৃষিতের এই শোচনীয় মৃত্যুর বদলা তিনি নেবেন এবং তা হরষিতের হাত দিয়েই। সকালবেলাতেই দুলালের সঙ্গে তার একপ্রস্থ গোপন কথাবার্তা হয়ে গেছে। গুমঘর আর টাকার যে ইঙ্গিত তৃষিত শেষবার দিয়ে গেছে তা থেকে মনে হয় বিরুদ্ধপক্ষ তাদের অনেকগুলো গোপন তাস কিনে ফেলেছে। নদীর ধারের তিনটে লোক অবশ্যই তাদের এজেন্ট, অথবা ওরা, নিজেরাই দলটার তিনটে চাঁই। এ বিষয়টা আরও গভীরভাবে জানা দরকার। ইন্সপেক্টার সুজিত ঘোষ তাকে

শ্রদ্ধা করলেও নিদারুণ সন্দেহের চোখে দেখেন। মাসের পর মাস নানা উড়ো খবর তার নামে থানায় পৌঁছে যাচ্ছে। কৈবর্ত্যপাড়া থেকে যে দুজন কনস্টেবল ওখানে মোতায়েন করা আছে তারা স্বয়ং এসে সেকথা তাকে জানিয়ে গেছে। পাকাপাকি প্রমাণ না থাকায় সুজিতবাবু সরাসরি তাকে কিছু বলতে পারেন না, কিন্তু ঠিক এই সময়েই তৃষিতের মৃত্যুটা গ্রহের মত ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিয়ে গেল।

ভাবনায় ডুবে গেলেন সন্তোষবাবু। বিরুদ্ধপক্ষ অবশ্য নিজেদের স্বার্থেই এখন চুপচাপ থাকবে। গুমঘরের কথা যখন তারা জেনেছে তখন লুকোন টাকার সন্ধান করতে আসাটা এখন ওদের পক্ষে বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে হইচই হওয়াটা ওরা পছন্দ করবে না। তবুও সুজিতবাবুর ভয়টা থেকেই যাচ্ছে। তবে যে'রকম তালকানা লোক তাতে চট করে.....

——আমি তাহলে এখন আসি, দাদু। হরষিতের কথায় সম্বিৎ ফিরল সন্তোষবাবুর। বললেন, এস।

ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে এ বারান্দা ও বারান্দা ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে বাগানে নেমে আসার মুখে কি মনে হতে আবার একবার পেছন ফিরে তাকাল হরষিত।

সন্তোষবাবু যেন ছায়ার মত চলে এসেছেন তার সঙ্গে। একটু চমক লাগল হরষিতের। মুখখানা কঠিন হয়ে উঠেছে সন্তোষবাবুর। বললেন, অনেক কথার ভেতর একটা জরুরী কথা চাপা পড়ে গেছিল। সেটা তোমার জানা দরকার, তাই আবার এলাম।

——কি কথা বলুন! গলাটা কেঁপে উঠল হরষিতের।

——তোমার জ্যাঠামশাই মৃত্যুর আগে যে গুমঘরের কথা বলে গেছিল——সেটা, তুমি এখ্‌খুনি যে ঘরে বসে কথা বলছিলে ঠিক তার নীচে অর্থাৎ মাটির তলায়। তারই একদিকে তোষাখানা। কথাটা কোথাও প্রকাশ করে আশা করি আমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করবে না।

হরষিতকে প্রায় স্ট্যাচু বানিয়ে দিয়ে হাতের ছড়িটি দোলাতে দোলাতে বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন সন্তোষবাবু।

॥ ৪ ॥

কৈবর্ত্যপাড়ার সাথে বামুনপাড়ার ক্রিকেট ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে বিশাল একটা সবেদা গাছের নীচে দশাসই একটা চেয়ারে বসে উদ্যোক্তাদের দেওয়া প্লাস্টিকের লম্বাটে ডবল কাপে কফি খাচ্ছিলেন সুজিতবাবু। ফাইনাল ম্যাচ। মাঠের চারধারে লোক গিজগিজ করছে। এক সুজিতবাবুর মাথার ওপরে ছাতার মত গাছটি বাদ দিলে অন্যান্য সমস্ত বড় গাছেই ডজনখানেক করে লোক।

কফি খেতে খেতে চোরাচোখে চারদিকটা মেপে নিতে আরম্ভ করলেন সুজিতবাবু। এই দুটো পাড়াকে তার পৃথিবীর বাইরের বলে মনে হয়। আজ পাক্কা তিন তিনটে বছর এখানকার থানার দায়িত্বে থেকেও এই দুটো পাড়া থেকে একটাও অভিযোগ এসেছে বলে শোনেননি সুজিতবাবু। শুধু এইই নয়, গোটা মোহিতবিতান গ্রামখানাই যেন রহস্যময় রকমের ভদ্র। কখনও এখানে চুরি ডাকাতি হয়েছে বলেও শোনা যায় না। আজ অ্যাদ্দিনে এ'রকম একখানা জায়গায় তৃষিত লাহিড়ীর হত্যাকাণ্ড যেন সেই মহিমায় খানিকটা কাদা লেপে দিয়ে গেল।

একটা দীর্ঘঃশ্বাস পড়ল সুজিতবাবুর। গতকাল পাওয়া পোস্টমর্টেম রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা গেছে, যে গুলির আঘাতে তৃষিতবাবু মারা গেছেন তা ছোঁড়া হয়েছে কোনও বিদেশী স্বয়ংক্রিয় রিভলবার থেকে। একবার যখন এসব অস্ত্র গ্রামে ঢুকতে শুরু করেছে তখন তৃষিতবাবুর মৃত্যুতেই নিশ্চয়ই ব্যাপারটা থেমে থাকবে না। এরপর কার পালা? সন্তোষবাবুর! গোড়া থেকেই তার সন্দেহ, সন্তোষবাবু আর তৃষিতবাবু কোনও গোলমেলে ব্যাপারে জড়িত। স্কুল, হাসপাতাল, চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ক্ষেতখামার——সব জায়গাতেই দুজন একসাথে। কিন্তু এই দুজনকে সামান্য ঘাঁটাঘাটির চেষ্টাতেই অন্তত শ'দুয়েক লোকের নাম বেরিয়ে আসায় রণে ভঙ্গ দিয়েছেন সুজিতবাবু। তবুও আজ খেলার মাঠে তাকে আসতে হয়েছে, কেননা তৃষিতবাবুর লাশ আইনানুগভাবে হরষিতের দাহকার্য ও শ্রাদ্ধশান্তির জন্য হস্তান্তরিত করা হয়েছে এবং অপঘাতে মৃত্যুর দরুণ আজ রাত্রেই খাওয়া দাওয়ার কাজটাও চুকে যাবে। এ'রকম একটা সময়ে

কাছেপিঠে তার থাকা উচিত। যে কোনও সময়ে যে কোনও কিছু ঘটে যেতে পারে। সে কারণে ক্রিকেট ম্যাচের ব্যাপারটা তার বেশ মনোমত হয়েছে। আমন্ত্রণী কার্ডটা হাতে পাওয়া মাত্রই সাদা পোশাকে জনাকয়েক আড়কাঠিকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন গ্রামের এদিকে ওদিকে, আর নিজে উপস্থিত হয়েছেন গ্রামের ঠিক কেন্দ্রে সন্তোষবাবুর বাগানের ধার ঘেঁষে পুবমুখো এগিয়ে যাওয়া পাক্কা ছ'বিঘের এই মহাকালী মাঠে।

শীতের রোদের মিঠে আমেজটুকু উপভোগ করতে করতে সুজিতবাবু দেখলেন, সন্তোষবাবুর বাড়ির বাহির মহলের দিক থেকে সাদা পোশাক পরা একদল ছেলে বেরিয়ে এল। প্যাড, গ্লাভস পরা ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধের জন্য খেলোয়াড়েরা সন্তোষবাবুর বাড়িটাকেই ব্যবহার করছে। সুজিতবাবু ভাবলেন, যাক্, অন্তত বৃত্তটা খানিকটা ছোট হয়েছে এতে। আপাতত এ বাড়িটার দিকে নজর রাখলেই যথেষ্ট।

ইতিমধ্যেই খেলোয়াড়দের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন সাদা কোট কালো প্যান্ট পরা একদম মার্কামারা দুজন আম্পায়ার। এদের সঙ্গে স্যুট পরা টিপ্‌টপ্ এক ভদ্রলোক। তার হাতে লেটেস্ট মডেলের একখানা জাপানী ভিডিও ক্যামেরা। টেরিয়ে গেলেন সুজিতবাবু। স্যুট পরা ভদ্রলোক নিশ্চয়ই থার্ড আম্পায়ারের ভূমিকা নিতে চলেছেন, এবং সেটা এইখানে—এই মহাকালী মাঠে!

বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই ওদিকে টস হয়ে গেছে। অনুষ্ঠানের সভাপতিকে নিয়ে স্থানীয় ক্লাবগুলোর সদস্যরা প্রায় আড়াই ফুট লম্বা মহাকালী শীল্ডটাকে টেবিলের ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে তার ওপর খাড়া করে রেখেছে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের জন্য নির্দিষ্ট ট্রফিটি ফুট দেড়েক। এছাড়া লীগ পর্যায়ে যে সব টীম অথবা খেলোয়াড় কৃতিত্ব দেখিয়েছে তাদের জন্যও রয়েছে রকমারী পুরস্কার। তবে, সব কিছুর গায়েই মা কালীর জিভ বের করা মুখটা কেন খোদাই করা রয়েছে সুজিতবাবু সেটা বুঝতে পারলেন না।

সভাপতি হয়েছেন মহাকালী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পৌনে পাঁচ ফুট উচ্চতার অধিকারী জ্যোতি গাঙ্গুলী। জ্যোতিবাবুর কপালে একটা এক

টাকার কয়েনের সাইজের আব আছে। মাথা থেকে ইঞ্চি দেড়েক এগিয়ে থাকায় ছাত্ররা সেটাকে হেডলাইট বলে। অনেকে আবার বলে, জ্যোতিবাবুর বুদ্ধির পঁচাত্তর ভাগই ঐ আবে। গভীর চিন্তা ভাবনার কোন বিষয় এসে সামনে উপস্থিত হলে জ্যোতিবাবু বারকয়েক তার আবে টোকা দিয়ে যেসব সলিউশান বের করে আনেন তার জবাব নেই।

অনেকক্ষণ সুজিতবাবুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করছিলেন জ্যোতিবাবু। সুজিতবাবু যদিও হাসি হাসি মুখে মাঠের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তবুও এ'রকম সময় যে খবরটা তাকে জ্যোতিবাবু দিতে চলেছেন তাতে তার নিজেরই সন্দেহ হল, কিছু গড়বড় হতে পারে। আসলে সুজিতবাবুকে দারুণ ভয় করেন জ্যোতিবাবু। একবার থানার সামনের বেনারসী পেয়ারার গাছটা থেকে পাক্কা এগারোটা পেয়ারা খাওয়ার পর পেছন থেকে সুজিতবাবু এসে তাকে কিছু সদুপদেশ দেওয়ার পর থেকেই এই ভয়ের উৎপত্তি।

এই শীতের বেলাতেও বিন্ বিন্ করে ঘামছিলেন জ্যোতিবাবু। তারপর চারপাশে লোকজন দেখে তার সাহস বেড়ে গেল। বুক ঠুকে সুজিতবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, স্যার, একটা ভীষণ জরুরী কথা ছিল।

সুজিতবাবু মনোযোগ দিয়ে বাউণ্ডারীতে চুন ফেলা, ক্রিজের ঘাস ছাঁটা, উইকেটের ওপর বেল বসানো——এসব দেখছিলেন। জ্যোতিবাবুর কথায় একটু বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, স্যারটা বাদ দিয়ে, স্যারটা বাদ দিয়ে....

——ইয়ে, সুজিতবাবু, এখানে আসবার সময় আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন দেখলাম অনেকগুলো লোক সেখানে জমিয়েছে আর বাড়ির ভেতর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

——ভূমিকাটা বাদ দিন। অসহিষ্ণু গলায় বললেন সুজিতবাবু।

বাধা পেয়ে জ্যোতিবাবুর তালভঙ্গ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললেন, আপনার ছেলে একতলার ছাদ থেকে নীচে পড়ে গেছে। কনুই আর হাঁটুতে চোট পেয়েছে। নীচে বালির ঢিবি ছিল বলে রক্ষে......

—এই ব্যাপার! সুজিতবাবুকে বেশ আশ্বস্ত মনে হল। বললেন, ঘোঁতন ও'রকমই ছেলে......চিন্তার কিছু নেই। বোধহয় আমার ছাতাটাকে প্যারাসুট বানিয়ে ছাদ থেকে লাফ মেরেছে।

—হুঁ! কী করে জানলেন বলুন তো? একদম ঠিকঠাক বলেছেন,—হাওয়ায় ছাতাটা শুধু উল্টোদিকে খুলে গেছ্‌ল।

—আপনি বসুন। এতে উত্তেজনার কিছু নেই। আমি তিনদিন ওকে ছাতাটা নিয়ে ছাদে ঘুরঘুর করতে দেখেছি। আমার জন্যই অ্যাদ্দিন কিছু করতে পারেনি। আজ আমি নেই বলেই.....

—কিন্তু, কিন্তু.....

—কোনও কিন্তু নেই। ঘোঁতনকে আপনি চেনেন না। গতবছর চোখে সর্ষেফুল কেমন করে দেখা যায় পরীক্ষা করতে গিয়ে ও একটা চলন্ত সাইকেলের স্পোকের ভেতর পা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

জ্যোতিবাবু আর কথা বাড়াবার প্রয়োজন দেখলেন না।

খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। বামুনপাড়া টসে হেরে ব্যাটিং। সুজিতবাবু নড়েচড়ে বসলেন। ক্রিকেট খেলা দেখার সময় তার মাথার ঠিক থাকে না। এই মুহূর্তে তার মনেই নেই কিজন্য তিনি মাঠে এসেছেন।

বামুনপাড়ার শিবপদ গোস্বামী আর ননী ভট্টাচার্য্য নিয়মিত ওপেনার। একুশটা ম্যাচে ওপেন করে প্রথম উইকেটে পাঁচটা শতরানের একটা রেকর্ড ওরা আগেই তৈরি করে রেখেছে। তাই শিবপদ আর ননী যখন বাবলগাম চিবুতে চিবুতে উইকেটের দিকে যায় তখন বিপক্ষের বোলারদের পেটের ভেতরটা পর্যন্ত ঠাণ্ডা মেরে যায়। আজও তাই-ই হল।

আগের ম্যাচে দলগত ছেষট্টির মাথায় ননী উজবুকের মত বাউণ্ডারি লাইনে ক্যাচ তুলে আউট হয়েছিল বলে শিবপদ আজ পই পই করে তাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলেছে। কিন্তু স্টান্স নেওয়ার আগে থেকেই উশখুশ করছে ননী। কৈতর্ব্যপাড়ার বোলাররা অন্য ধাতে গড়া। তাদের অন্যতম সেরা দুজন পেস বোলারের একজন নন্দ দিগারী ননীর ছটফটানি দেখে মৃদু হাসল।

অফস্টাম্পের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে কিছু বলল ননী। এটা আসলে কালীবন্দনা। চুম্বকে স্তব সেরে উইকেটকিপার হেঁসো মোড়লের দিকে তাকিয়ে ননী বলল, প্রথম হুকটা যখন করব তোর চাঁদি ফেটে যাবে।

হেঁসো গম্ভীরভাবে বলল, সামনে তাকা। আগে দু'ওভার টেক, তারপর কথা বল।

ননীর মাথায় আগুন ধরে গেল। স্টান্স নিল সে। বিচিত্র স্টান্স। ব্যাট উঠে গেল উইকেটকিপারের নাক বরাবর। এ ধরনের স্টান্সে ননীর সুবিধে হয়। আলাদা করে ব্যাক লিফ্টের দরকার হয়না। তবে ব্যাট নামানোর সময় টাইমিং-এর গণ্ডগোল স্ট্যাম্প ছিটকে যাওয়ার ভয় থাকে। ননীর প্লাস পয়েন্ট তার চোখ, কব্জি আর কাঁধের জোর।

ওভার দ্য উইকেট বল করতে এল নন্দ। আম্পায়ারের কানের পাশ দিয়ে তার হাতটা বিদ্যুতের মত ঘুরে গেল। শিবপদ দেখল, ননীর হাতদুটো ব্যাটসমেত যন্ত্রের মত স্লিপের দিকে চলে গেল আর তারই কানায় লেগে বলটা দুটো ড্রপে সোজা বাউণ্ডারির বাইরে একেবারে সভাপতি আর প্রধান অতিথির চেয়ার দুটোর কাছাকাছি গিয়ে থামল। জ্যোতিবাবু ধুতি সামলে লাফ দিয়ে উঠে বলটা কুড়িয়ে মাঠের ভেতর ছুঁড়ে দিয়েই বুঝতে পারলেন, সভাপতি হিসেবে কাজটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। কিন্তু সুজিতবাবু তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন দেখে ততোধিক উৎসাহে তিনি হাততালি দিতে আরম্ভ করলেন আর তার সঙ্গে যোগ দিল মাঠের প্রতিটি দর্শক।

প্রথম চারটা মারার সঙ্গে সঙ্গেই ননী শিবপদের দিকে তাকিয়েছিল। বন্ধুকে সে একটু সমীহের চোখে দেখে। শিবপদ একটু ধরে খেলার পক্ষপাতি। কিন্তু দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর তার খেলা দেখলে ননীর মনে হয়, শিবপদের কাছে সে আসলে নস্যি।

শিবপদ ননীর বদলে নন্দর বলের দিকে লক্ষ্য রাখছিল বেশি। উত্তুরে হাওয়া এসে ঝাপ্টা মারছে বোলারস্ এণ্ডে——একদম উল্টোমুখো। স্বভাবতই নন্দর বলের গতি কমে যাচ্ছে।

আবার দৌড়ে এল নন্দ। প্রথম চারের মারটা তার এলেবেলে বলে মনে হয়েছে। অতএব এবার অফ্ অ্যাণ্ড মিড্‌লে সে একটা ধীরগতির বাঁক খাওয়ানো বল ফেলল। বোধহয় শিবপদের কথাটা মাথায় রেখেই বলের লাইনে গিয়ে একটা মন খারাপ করা ফরোয়ার্ড-স্ট্রোক নিল ননী। নন্দর ভেতর সামান্য আত্মতুষ্টির ভাব দেখা গেল। তার ফলে তৃতীয় বলটা লেগস্টাম্পের সামান্য ওপরে ; এবার ননীর ব্যাট কাটারির মত দ্রুত চলল। পিচের ওপর সামান্য ধুলো উড়তে দেখল নন্দ, তারপর বাউন্ডারী লাইনের ওপরে একটা কাঁঠাল গাছের মাথা থেকে বলটা ফেরত এল। কোন একজন গাছের ডালে বসেই ক্যাচটা ধরেছে।

সুজিতবাবু চমৎকৃত হয়ে গেছেন। এত মসৃণ ছয়ের মার এত কাছে থেকে তিনি প্রায় দেখেনইনি।

এদিকে তিনটে বলের ভেতর একটা চার আর একটা ছয় খেয়ে একটু মুষড়ে পড়লেও পরের বলগুলো গুড লেংথে রেখে একটা রানও নন্দ ননীকে করতে দিল না।

ড্রিংকস ব্রেকের আগেই রান পৌঁছে গেল অষ্টাশিতে এবং সেটা বিনা উইকেটেই। শিবপদ মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলে আঠাশ। সে মাত্র দু'খানা চার মেরেছে। ননীর তখন হাফ্ সেঞ্চুরি হয়ে গেছে। তার মধ্যে সাতটা চার আর একটা ছক্কা। নো আর ওয়াইড থেকে এসেছে বাকি কটা রান।

সাধারণভাবে মহাকালী মাঠে একদিনের ম্যাচগুলো পঁয়ত্রিশ ওভারের বেশি হয় না, কিন্তু আজকের ব্যাপার আলাদা। এই শিল্ডের জন্য সারা মাস হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। স্বভাবতই ফাইনাল ম্যাচটাকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ওভারের সংখ্যা বাড়িয়ে চল্লিশে তোলা হয়েছে।

আকর্ষণের মাত্রাটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে সতেরোতম ওভার থেকে উপস্থিত সকলে টের পেল। ননী পঞ্চাশ ছাড়াবার পরই যেন খেপে গেল শিবপদ। মাঠ জুড়ে কেতাদুরস্ত কাট, হুক আর পুলের বন্যা বয়ে গেল। সেই ফাঁকে একটুখান বিশ্রাম পেয়ে গেল ননী। তারপর সে আবার তার

নিজের মত খেলতে আরম্ভ করল। ক্রশ ব্যাটে এলোপাথাড়ি একেকটা শট এসে আছড়ে পড়তে লাগল বাউন্ডারিতে। রান সংখ্যা পৌনে দুশোতে এসে পৌঁছতে কৈবর্ত্যপাড়ার প্রায় প্রত্যেকেরই চোখে জল দেখা যাচ্ছে। রান দেওয়ার ব্যাপারটা দাঁতে দাঁত চেপে মেনে নিলেও একজনকেও আউট করতে না পারার ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না তারা।

উইকেটের পেছনে হেঁসোর করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে সেঞ্চুরি ছুঁইছুঁই ননী বলল, তোর মাথাটা কিন্তু এখনও ফাটাতে পারলাম না, রে। দেখি, এই ওভারে.......

কথার মাঝখানেই থেমে যেতে হল ননীকে। স্লগ ওভার শুরু করতে চলেছে নন্দর পার্টনার অরবিন্দ মন্ডল।

অরবিন্দর হাতটা বাতাসে পাক খেয়ে তখনও পুরোপুরি নীচে নামেনি। এমনসময় তার পেছনদিকে বিকট একটা বিস্ফোরণের শব্দের সঙ্গে খানিকটা আগুনের দলা আর মেঘের মত ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে লাফিয়ে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য ননীর মনে হল যেন আগুনের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল অরবিন্দ। তার পরের মুহূর্তেই সে দেখতে পেল ধুতিতে জড়িয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছেন জ্যোতিবাবু, আর তাকে টপকে রিভলবার হাতে বিস্ফোরণের জায়গাটা লক্ষ্য করে ছুটে যাচ্ছেন সুজিতবাবু। একটা গাবগাছের পেছন থেকে ভিডিও ক্যামেরায় গোটা ব্যাপারটা ধরা হচ্ছে।

সমস্ত মাঠ যেন অদৃশ্য কোন অঙ্গুলিহেলনে স্তব্ধ হয়ে গেল। সুজিতবাবু রিভলবার হাতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, সবাই শান্তভাবে থাকুন। নড়বেন না। আমি দেখছি কী হয়েছে।

কিন্তু, এক ইঞ্চিও এগোতে পারলেন না সুজিতবাবু। মাঠের শেষের জঙ্গলের ভেতর থেকে একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। একটানা মেশিনগান চললে যেমন আওয়াজ হয় শব্দগুলো যেন তেমনই।

॥ ৫ ॥

নিজের লাইব্রেরি রুমে দুলালকে নিয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিল হরষিত। হরষিত তার সাধারণ পাজামা-পাঞ্জাবীই পরে আছে, কিন্তু দুলালকে দেখলে এখন তার মা'ও চিনতে পারবেন না। দারুণ একখানা সাফারী স্যুট পরে রয়েছে সে। চোখে বিদেশী রোদ চশমার সঙ্গে ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফ চলে এসেছে তার। মাথার উইগটা অবশ্য হরষিতকেই জোগাড় করে দিতে হয়েছে। উপস্থিত সেটা একটা চেয়ারের হাতলে লাগানো।

একটু আগে মাঠের দিক থেকে ভেসে আসা বিস্ফোরণের শব্দটা চিন্তায় ফেলেছিল হরষিতকে, কিন্তু তার পরের ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন। বিস্ফোরণগুলোর কারণ নাকি কতগুলো চকোলেট বোম! আবিষ্কারটা দুঁদে অফিসার সুজিতবাবুকেও না কি অবাক করে দিয়েছে। খেলোয়াড়দের একজন এসে বলে গেল, অদ্ভুত ব্যাপার, হরষিতদা। প্রথমবার সেটা ফাটল সেটা আসলে তিনবাক্স চকোলেট বোম। একটা জায়গায় খানিকটা আগুন জ্বালিয়ে কেউ বোমগুলো তার ওপর একসঙ্গে ফেলে দিয়েই সরে পড়েছে। কেমনভাবে ফেলেছে সেটা বোঝাবার ব্যবস্থাও সে করে রেখে গেছে। চকোলেট বোমের তিনটে খালি প্যাকেট পেয়েছেন সুজিতবাবু আর শরীরের অর্ধেকটা উড়ে যাওয়া একটা বাখারি। তার মাথায় নির্ঘাত ঝুলি জাতীয় কিছু লাগিয়ে চকোলেট বোমগুলো তাতে ভরে গাছের আড়াল থেকে সেটা আগুনের ভেতর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতেই ঐ বিরাট আওয়াজ।

ঐ খেলোয়াড়টিকে হরষিত জিজ্ঞেস করেছিল, তাহলে ঐ মেশিনগানের মত শব্দ.....

——ওটা আর একটা মজা। কেউ পাকানো তারের ফাঁকে একেকটা চকোলেট বোম লাগিয়ে বাউন্ডারি লাইনের পেছনে লম্বা করে শুইয়ে রেখেছিল। তারটাকে দু'মাথায় দুটো খুঁটির সাথে বেঁধে মাইন পুঁতে রাখার মত একটা ব্যাপার করেছিল। এভাবে মাটির ওপর শোয়ানো ছিল একশোটার মত চকোলেট বোম। পলতেগুলো যেদিকে পড়ে সেদিকে সোরা দিয়ে একটা সরু খালও করা ছিল। আমরা ধারণা বড় বিস্ফোরণটা হওয়ার সাথে সাথেই সোরার খালে আগুন লাগানো হয়েছে। সুজিতবাবু মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম পলতেতে আগুন লেগেছে.....তারপর দ্বিতীয়টাতে....এভাবেই সব কটায়। তারটাকে আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। একটু মোটা, তাই কোথাও ছেঁড়েনি। কিন্তু, সেটার সারা গায়ে শ্বেতির মত দাগ হয়ে গেছে।

খেলোয়াড়দের ভেতর কেউ অবশ্য জানে না, যে ঘরের মধ্যে হরষিতের সঙ্গে রয়েছে দুলাল। যখনই কেউ এসে দরজায় টোকা দিচ্ছিল দুলাল সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ছিল লাইব্রেরির লাগোয়া ছোট ঘরখানায়।

এত সাবধানতার কোন দরকার চিল না। কিন্তু সন্তোষবাবুর এ'রমই নির্দেশ। তার ধারণা, খুনীরা দুলাল সম্বন্ধে যেহেতু ওয়াকিবহাল, যেহেতু সে অকুস্থলে উপস্থিত ছিল, সেহেতু তাকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তার এ'ও ধারণা, যদিও গ্রামের সাবেক রীতি অনুসারে তৃষিতের শ্রাদ্ধশান্তির দায়িত্ব আশেপাশের বাড়ির মেয়ে-বৌ আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের, তা সত্ত্বেও এই ডামাডোলের দিনটাকেই তারা কাজের সুবিধের জন্য বেছে নেবে।

এছাড়া হরষিত ব্যক্তিগতভাবেও একটা ছোট্ট টোপ ফেলেছে। ছদ্মবেশী দুলালকে দিয়ে তাদের বাড়ির কিছু কিছু মালপত্র অন্যত্র সরিয়ে ফেলার কথাটা সে চাউর করে দিয়েছে। স্থানীয় বাজার, চায়ের দোকানগুলোয় ঘুরে ঘুরে কাজটা করেছে দুলাল। তার আর হরষিতের দুজনেরই ধারণা, খুনীরাও ছদ্মবেশে কাছাকাছি ঘুরছে। গুমঘরে জমানো টাকার কথা তারা

যেভাবেই জেনে থাকুক, বেশি দেরি হলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতার পর্যবসিত হবে এই ভেবে নিশ্চয়ই আজই কোনও একসময় আক্রমণ করবে তার বাড়ি।

এদিক ওদিক চেয়ে দুলাল বলল, হরষিত, বাপনকে ও বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এলে হয় না?

হরষিত বলল, হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। মা আর দাদু তো সারাদিন ওকে আটকে রাখতে পারবে না। তাছাড়া, সকাল থেকেই দেখছি ও রান্নার জায়গাটার কাছে ঘুরঘুর করছে।

দুলাল বলল, ছেলেটাকে নিয়েও যে ভয় আছে সে কথা ওর বাবার কাছে বলতে বোধহয় সঙ্কোচ হচ্ছে সন্তোষবাবুর।

——এইতো খেলা শুরু হওয়ার একটু আগেই গুটিগুটি ঢুকলেন।

——মরেচে! এতো ঝামেলা আরো বাড়ছে। আমাদের কি উনিও জানেন?

——না না, উনি একেবারে অন্য জগতের মানুষ। তবে, এবার তো ওনাকে সব জানাতেই হবে।

——হ্যাঁ। কিন্তু, আমি যেমনভাবে জেনেছি সেভাবে না জানানোই ভাল।

দুলাল কিছু বলল না। মেঝের এককোণে নামিয়ে রাখা ব্যাগটা কোলের ওপর তুলে চেন টেনে সেটার পেটের ভেতর থেকে এক এক করে কতগুলো জিনিস বের করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখল।

হরষিত আনমনে বইয়ের তাকের দিকে তাকিয়েছিল।

দুলাল বলল, রাত্তিরে আর হবে না....খাওয়া দাওয়া নিয়ে সব ব্যস্ত থাকবে।....আমি তাই মালপত্তর খানিকটা জোগাড় করে রাখলাম।

জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক হলেও ও'রম হওয়াটা সম্ভবত অভ্যাসের পর্যায়ে চলে গেছে বলেই হরষিতের মুখ থেকে কোন শব্দ বেরোল না।

একটা গুপ্তি, দুটো সরু ফলার ছোরা, দুটো বেসবল খেলার ক্লাব বা মুগুরের মত ডান্ডা আর দু'খানা কাঠের হাতলে বাঁধা ফিনফিনে সরু একটা তারের অস্ত্র নিজের চোখের সামনে পড়ে থাকতে দেখল হরষিত। তারটা কারো মাথার পেছন থেকে গলায় পরিয়ে কাঠের হাতলগুলো টেনে ধরে প্যাঁচাতে থাকলে তার কি অবস্থা হবে বুঝতে হরষিতের খুব একটা অনুমান প্রয়োজন হল না।

——কিন্তু, রিভলবার-টার কিছু নেই? দিন কয়েক আগের স্মৃতি ঘেঁটে হরষিতের এই অস্ত্রসজ্জাকে যথেষ্ট বলে মনে হল না।

দুলাল বলল, জিনিসপত্তর তো সারা দেশেই ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু, ঠিক এই সময়টায় এখানে এসবের একটু অভাব। তবে, সন্তোষবাবুর কাছ থেকে দুটো রিভলবার পাচ্ছি। গণেশকে ও'দুটো পরিষ্কার করে গুলি ভরতেও দেখে এলাম। এছাড়া সন্তোষবাবুর নিজের রিভলবারটা তো আছেই। বর্শা টর্শাগুলো গ্রামের আর সবাই ভাগাভাগি করে নিয়েছে।

——তুমি কি আমাকেও একটা রিভলবার দেওয়ার কথা ভাবছ?

——তা নয়ত কি?

——কিন্তু, আমি তো ওসব চালাতে জানিনা।

——তাতে কিছু আসে যায় না, বিপদে পড়লে....

দরজায় খুট্ করে একটা আওয়াজ হল। কয়েক সেকেন্ডের ভেতর দুলাল ওপরের জিনিসগুলো টেবিল থেকে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে ছোট ঘরটার ভেতর লুকিয়ে পড়ল।

হরষিত উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। ঘরে ঢুকল গণেশ আর বাপন।

হরষিত বলল, একি গণেশ! তুমি বাপনকে বাইরে আনলে কেন? দাদু কিছু বলবেন না?

গণেশ বলল, বাপন চিলেকোঠা থেকে কিছু একটা দেখেছে, তোমাকে

সেটা বলতে চায়। তাড়াতাড়ি কর। আমার আবার রান্নার জায়গাটা দেখতে যেতে হবে, আর.....

ঢোলা পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার ক'রে হরষিতের হাতে তুলে দিল গণেশ। হরষিত অনুভব করল তার হাতদুটো ভারি হয়ে উঠছে আর এই শীতের মধ্যেও তার কপালে দেখা দিচ্ছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

গণেশ এসবের দিকে নজর দিল না। শুধু দরজাটা ভেজিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলল, দুলালকে তৈরি হয়ে নিতে বল, হরষিত। আমরা একটু পরেই গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ব।

সাধারণ চাষী মানুষ গণেশ। তার এই দ্বিতীয় সত্ত্বার কথা ভাবতে ভাবতেই ছিটকিনিটা আটকে দিয়ে দরজার দিকে পেছন ফেরাতেই হরষিত দেখল, দুলাল আস্তে আস্তে তার লুকোনোর জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে আর বাপন অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

হরষিত বুঝল, দুলালের এই পরিবর্তনে বাপনেরও ধাঁধা লেগে গেছে। কিন্তু এসবের সময় পরেও যথেষ্ট পাওয়া যাবে। তার আগে জানা দরকার কি দেখেছে ছেলেটা। সে বলল, তুমি কি একটা দেখেছ শুনলাম। আমাকে বলতে পার?

বাপন বলল, দাদু তো তাই বলল। বলল, তোমার কাছে দুলালদা আছে....দুজনকেই গিয়ে যেন বলি।

দুলাল বলল, কি ব্যাপার?

বাপন বলল, হরষিতদা, তোমার ছাদের ঘরটা খোলা আছে? ওটায় চল.....না হলে দেখতে পাবে না।

হরষিত আবার উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। মুখে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খোলা আছে, চল——

সিঁড়ি দিয়ে চিলেকোঠায় উঠে এল তিনজন। ছাদের ওপর মাত্র এই একটি ঘর। কিন্তু বেশ বড়সড়। সেটার একটা জানলা খোলা। হু হু করে উত্তুরে হাওয়া ঢুকছে সেটা দিয়ে।

দুলাল আর হরষিত দুজনের হাত ধরে বাপন সেই জানলার পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। এক নজরে অনেকদূর পর্যন্ত তাকিয়ে উদার সবুজ গাছপালার এক ঘনবসতি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সেদিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে যাচ্ছিল হরষিত। এমনসময় বাপন সজোরে চেপে ধরল তার বাঁ হাতটা। হরষিত বলল, কী? কী?

দুলাল বলল, ঐ যে, জলার পাশের দিকটায় দেখ।

হরষিত বলল, তিনটে লোক মনে হচ্ছে! ঈস্, কুয়াশা পড়তে আরম্ভ করেছে!

বাপন বলল, ঐ লোক তিনটেকে একটু আগে থেকেই দেখছি। কী যেন করছে ওখানে। জলার ওখানটায় তো কেউ যায় না, তাই ভাবলাম তোমাদের গিয়ে দেখাই। আর কুয়াশা পড়ছে দেখে এটা নিয়ে এসেছি।

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা দূরবীণ বের করে হরষিতের হাতে দিল বাপন।

দূরবীণটা দুলালের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার সময় মনে মনে বাপনের স্থিরবুদ্ধির প্রশংসা করল হরষিত। ততক্ষণে সেটায় চোখ রেখে আলতোভাবে নেমে আসা অন্ধকারে দৃষ্টি দিচ্ছে দুলাল।

শীতের সন্ধ্যা তড়িঘড়ি চলে আসে। তবুও এখনও যতটুকু আলো আছে তাতে দুলাল স্পষ্ট দেখতে পেল জলার পাশে গাছপালার একটু আড়ালে তিনটে লোক বেশ জুত করে বসেছে। তিনজনের গায়েই গরম চাদর জাতীয় কিছু জড়ান। দূরবীণের কল্যাণে মুখগুলোও আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। দাড়ি গোঁফ কামানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মুখ।

হঠাৎ কী মনে হতেই পেছন ফিরল দুলাল। সরাসরি বাপনের চোখের দিকে তাকাল।

তার দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বাপন বলল, সেদিনের ঐ তিনটে লোক। দাড়ি গোঁফ কামিয়েছে।

হরষিত বলল, তুমি চিনতে পেরেছো তাহলে!

——প্রথম তো একজন ছিল। একটা ব্যাগে করে দুটো বড় ক্যাসারল নিয়ে এসে ঘাসের ওপর বসল। সেগুলো থেকে খাবার দাবার বের করতে করতেই যখন আর দুজন এল তখনই ভাল করে দেখে বুঝতে পারলাম——এরাই সেই লোক।

দুলাল আবার দূরবীণটা ভাল করে বাগিয়ে জলার দিকে তাকিয়ে বলল, বাপন ঠিকই বলছে, হরষিত। লোকগুলো খাওয়া দাওয়া সেরে জলায় হাত ধুচ্ছে। ক্যাসারলগুলো খোলা অবস্থায় পড়ে আছে দেখতে পাচ্ছি।

——রাত্তিরবেলায় কাজের প্রস্তুতিপর্ব চলছে। খুব ঠাণ্ডামাথার লোক এরা, দুলাল।

দুলাল বিমর্ষভাবে বলল, তোমার জ্যাঠামশাইকে খুন করার একটু আগেও ওরা শান্তভাবে বসে আমারই দোকানের জিলিপি খাচ্ছিল।

——আচ্ছা, সুজিতবাবু তো রিভলবার নিয়ে মাঠে রয়েছে। এখ্‌খুনি গিয়ে সব বলে এলে তো ওদের এখানেই ধরে ফেলা যায়। বাপন বলল।

দুলাল আর হরষিতের মধ্যে মুহূর্তে চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। তাদের সংগঠনের কথা এ বয়সে বাপনের বোঝার কথা নয়। তাই এ'রম অবস্থাতে ভেতরের কোনও কথাই তাকে বলা যাবে না। এছাড়া সুজিতবাবু যদি ঘুণাক্ষরেও এই গ্রামের ভেতর এতবড় একটা কর্মকাণ্ডের হদিশ পেয়ে যান তাহলে আর দেখতে হবে না। সে কারণেই সমস্ত ঝামেলা নিজেদেরই সামলে নিতে হবে। সন্তোষবাবুর বাড়ির মাটির নীচের ঘরে জমান টাকায় এখনও বহু গরীব মানুষের মুখে হাসি ফোটান বাকি। বাকি অসংখ্য মানুষকে সঙ্গী করে অসংখ্য কাজ শেষ করা। আজ যখন একখানা গোটা গ্রাম ঠিক দারিদ্রমুক্তির দোরগোড়ায়, তখনই.....

বাপন বলল, কি দুলালদা, যাব? গিয়ে বলব?

দুলাল বলল, শোন বাপন। তোমাকে বুঝিয়ে বলার সময় নেই। দেখ, লোকগুলো এখনই সরে গেছে। কে জানে কোথায় গিয়ে লুকোবে। সুজিতবাবুর পুলিশরা যদি এখনই ওদের খুঁজতে ওখানে যায় ওরা হয়ত

গুলি টুলি ছুঁড়বে। তাতে বিস্তর লোকের ক্ষতি হয়ে যাবে। তার চেয়ে ভাল হয় যদি ওদের আমরা নিজেরাই ধরি। ওরা একবার আমাকে দেখেছে বটে, কিন্তু এখন দেখলে আর চিনতে পারবে না, আর হরষিতকেও ওরা আগে দেখে না থাকলে আরও সুবিধে, তুমি কি চাও না আমরা সবাই মিলেই ওদের ধরি ?

বাপন একটু নরম গলায় বলল, চাই-ই তো। ওরা হরষিতদার জ্যাঠামশাইকে গুলি করে মেরেছে.....কিন্তু, কিন্তু তোমরা লড়বে কি দিয়ে ?

দুলাল একবার ঢোঁক গিলে বলল, আমরা ভাল কাজের জন্য লড়ছি, বাপন। ভগবান আমাদের দেখবেন।

॥ ৬ ॥

ওরা সংখ্যায় তিনজন। তিনজনের শরীরেই দিন কয়েক আগের মত স্কিন টাইট গেঞ্জি আর জিন্স, তবে আজকের পোশাকগুলোর সবকটাই নিকষ কালো।

ধীরে বেড়ালের মত সতর্ক ভঙ্গিতে ওদের তিনজন সন্তোষবাবুর বাড়ির লাগোয়া খেলার মাঠের কোল ঘেঁষে ঘুমিয়ে থাকা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। শীতের ঝরা পাতার রাশি জঙ্গলে যেন একটা বিশাল বিছানা তৈরি করে রেখেছে। ঘন কুয়াশা নেমে এসেছে ঠিক মেঘের মত। মাটি থেকে ঠিক এক মানুষ উচ্চতায় ছেয়ে গিয়েছে সাদা জলবিন্দুর চাদর।

লোকগুলো জঙ্গলে ঢুকে কয়েকটা বড় গাছের আড়াল খুঁজে নিল। কুয়াশায় এক হাতের দূরের জিনিষও দেখা যাচ্ছে না।

এরপর ওরা কোমরের বেল্টের ওপর বসানো বোতামে হাত দিতেই সেখানে এক ধরনের ছোট ছোট আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোর মধ্যে যন্ত্রের মত ওরা পিঠের ব্যাগ নামিয়ে তার ভেতর থেকে কার্তুজের বেল্ট, গোটাকতক রিভলবার আর ছোরা বের করে ওদের কোমরগুলো সাজিয়ে নিল। তারপর প্রত্যেক প্রত্যেকের হাতে হাত রেখে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। যে কোন কঠিন কাজ শুরু করার আগে এটা তারা

করে থাকে। তৃষিত লাহিড়ীকে শুইয়ে দেওয়ার আগেও এভাবে খানিকটা সময় নীরবতা পালন করেছিল।

হঠাৎ নৈঃশব্দ ভেঙে কথা বলে উঠল ওদের একজন। সে বলল, আচ্ছা এক্স ; যে চিঠিটার ওপর বেস করে আমরা একটা মার্ডার করে ফেললাম সেটা যদি আসলে ফল্‌স্‌ হয় তাহলে তো সব ফক্কিকারি হয়ে যাবে।

এক্স নামধারী লোকটি ফোঁস করে উঠল। বলল, ফল্‌স্‌ হবে কেন ? তৃষিত লোকটাকে হেড কোয়ার্টার তিন বছর ধরে ওয়াচ করেছে। তলে তলে অন্য অনেকের সাথে ভিড়ে আমাদের অনেকগুলো অপারেশন বানচাল করে দিয়েছে লোকটা। এত মাল ও সরাল কোথায় !

প্রশ্নকর্তা নিজের পরিচয় দেয় 'ওয়াই' বলে। সে তৃতীয়, ওদের তিনজনের ভেতর সবচেয়ে ঠান্ডা লোকটাকে নির্দেশ করে এক্সকে বলল, সমস্ত ব্যাপারটা প্রথম থেকে জানে কেবলমাত্র জেড। ওই সব গুছিয়ে বলুক।

জেড এতক্ষণ সন্তোষবাবুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। ঠিক যেন মন্ত্রবলে বাড়ির চারদিকে হাজার ওয়াটের বেশ কয়েকটা বাল্ব জ্বলে উঠেছে। ঘন কুয়াশার ভেতর সেগুলো আশ্চর্য এক জ্যামিতিক আকৃতি নিয়ে জ্বলছে। অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর জেডের চোখগুলোও যেন তার সাথে তাল মিলিয়ে কেমন চক্‌মক্‌ করে উঠল।

সে বলল, তৃষিতবাবুর ভেতরকার ব্যাপার নিয়ে আমার অন্য সন্দেহ হয়। মাত্র শেষবারের এই অ্যাকশানে ওর মুখোশ ছাড়া মুখখানা আমি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু ওই চেহারা মিলিয়ে দেখেছি এই লোকটাই সে ! সাঙ্গোপাঙ্গোগুলো বদলে যায়, কিন্তু মূল গায়েন এই লোকটা প্রত্যেকবার আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি করে কেটে পড়েছে। এরপর একদিন গোয়াবাগানের একটা মেসে শিবনাথ নামে আমারই এক সাগরেদের সাথে দেখা করতে গিয়ে চমকে উঠি। দেখি, লোকটা শিবনাথের হাতে একটা খাম গুঁজে দিয়েই সরে পড়ল। কয়েকবার এনকাউন্টারে ওর চেহারা তখন আমার মুখস্থ। ওদিকে আমি নিজে তখন পাজামা-পাঞ্জাবী পরা বাবু।

দাড়ি-টাড়িও কামানো। অতএব, আমা। চেনার কোন প্রশ্ন ওঠেনা। শিবনাথ এর আগে টুকটাক্ পয়সাকড়ি আমার কাছ থেকে পেয়েছে। পঞ্চাশটা টাকার বিনিময়ে ও খামখানা আর একটা ঠিকানা কাগজে লিখে আমায় দিয়ে দিল। সেইসঙ্গে একটা মূল্যবান তথ্যও ফাউ হিসেবে পেলাম। লোকটার ভাইপো ঐ মেসটাতেই থাকে।

এরপর হেদুয়ার একটা বেঞ্চিতে বসে চিঠিটা পড়তেই চোখে অন্ধকার দেখলাম। মোহিতবিতান বলে কোন একটা গ্রামে সন্তোষবাবু বলে একটা লোকের বাড়ির নিচে লুকোনো একটা গুম্ঘরে নাকি রাজার ঐশ্বর্য জমা করে রেখেছে লোকটা। ভাইপোকে লিখেছে, তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরেই যেন সন্তোষবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেয়।

মনে হল কোলে একটা তাজা বোমা নিয়ে বসে আছি। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের এতদিনকার রুজি-রোজগার হাপিশ করেও সে সম্বন্ধে একটাও কথা খরচ করেনি লোকটা। মাথার ভেতর একটা প্রশ্নই ঘুরপাক খেতে লাগল, আমাদের এত খোঁজখবর ও পেল কোত্থেকে। বোঝাই যাচ্ছে গুমঘরে জমা করা মালের বিরাট একটা অংশই আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। তাহলে আমাদের দলে নিশ্চয়ই কোনও বিশ্বাসঘাতক আছে। ব্যাপারটা অনুভব করেই সিঁটিয়ে গেলাম। এরপর হাতের লেখা নকল করে পড়লেই বেশ ভয় ভয় করবে এভাবে আরেকটা চিঠি লিখে শিবপদর হাত দিয়ে ছেলেটার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। এটা করতে অনেকটা বাধ্য হলাম। কেননা, ভেবে দেখলাম, যা সাংঘাতিক লোক তাতে যদি আবার ফিরে এসে ভাইপোর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে নেয় তাহলে শিবপদ আর আমি দুজনেই ফেঁসে যাব। মালের টিকিটিও হয়ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসলে, লোকটা নাকি কখনই মেসে এসে বেশিক্ষণ থাকেনি।

হয়ত, ভাইপোটাকে খুব ভালবাসতো। ওকে চিনে ফেললে যদি ওরও কোনও ক্ষতি হয়—এই ভয় ছিল। দেখাই যাচ্ছে আন্দাজ করার ক্ষমতা ছিল লোকটার। ভাইপোটাকেও বলিহারি, কোন ফাঁকে যে গ্রামে রওনা দিল আগে টেরই পেলাম না। কিন্তু, এখানে এসে ঠিকানা মিলিয়েও একটা খট্কা থেকেই যাচ্ছে। সন্তোষবাবু তো দেখছি একজন

বুড়ো মানুষ। একটা বুড়ো লোকের এত ক্ষমতা, যে পাতাল ঘরে ধন সম্পত্তি লুকিয়ে আমাদের কলা দেখাবে! আর তৃষিতবাবুর সাঙ্গোপাঙ্গোরাই বা গেল কোথায়?

কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইল জেড। এক্স আর ওয়াই এতখানি সময় একটাও কথা বলেনি। এবার ওয়াই বলে উঠল, কাল সকালেই হয়ত মালপত্র পাচার হয়ে যাবে। এখনই হানা দেওয়া যাক।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল ওদের তিনজন। তারপর কোমরের ছোট্ট আলোগুলো নিভিয়ে বেড়ালের মত পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সন্তোষবাবুর বাড়ির দিকে।

দুলাল আর হরষিত বাপনকে তার বাবা-মায়ের কাছে রেখে এসেছে। সন্তোষবাবুর বাড়ির দোতলায় পাহারাদার আর পুরু শালকাঠের দরজা পেরনোর ক্ষমতা আততায়ীদের নেই। এ'রম একটা ধারণায় বিশ্বাস করা ছাড়া আর গত্যন্তরও নেই।

বাপনকে সরিয়ে দেওয়ার পরই হরষিতরা সন্তোষবাবুর সাথে চলে এসেছে একতলার সেই বিরাট হলঘরখানায়।

ভেতরে ঢুকেই সন্তোষবাবু ঘরের একমাত্র দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। হরষিত এবার লক্ষ্য করল ইয়া মোটা দরজার কাঠের পাল্লায় বিভিন্ন মাপের ছিটকিনির সংখ্যা পাঁচ। তার সবকটা নিজের হাতে আটকে বুকের ধড়ফড়ানি খানিকটা কমল হরষিতের।

হলঘরটা অসংখ্য আলোর উপস্থিতি সত্ত্বেও কেমন বিষন্ন। এর ঠিক নীচেই সেই রহস্যময় গুমঘর। হরষিত ভাবল। কিন্তু, কি করে পৌঁছানো যায় সেখানে?

দুলাল ইতিমধ্যেই প্রত্যেকটা জানলা বন্ধ করে দিয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার জায়গাটার চারদিকে নজর রেখেছে বলেই রক্ষে। কিন্তু, অনেকে মিলে ঘেরাও করলে আমরা কি পারব?

দুলাল বলল, অত ঘাবড়াবেন না, দাদু। আমাদের জীবন দিয়ে

হলেও গুপ্তধন আমরা গ্রামের বাইরে যেতে দেব না। আপনি কেবল ঘরটায় আমাদের নিয়ে চলুন।

সন্তোষবাবু দেওয়ালে টাঙানো তার বাবার একখানা বিরাট ছবির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে হরষিতকে বললেন, ছবিটা বাঁ দিকে স্ক্রু-এর মত ঘোরাও তো, হরষিত।

——ঘোরাব ?

——হ্যাঁ। ওই গোটা ছবিটাই আসলে একটা চাবি। ওর পেছনেই আছে গুমঘরে যাওয়ার রাস্তা।

সন্তোষবাবুর কথামত ছবিটার নিচের ডানদিকের কোণে আঙুলের চাপ দিয়ে একটু ওপরে তুলে দিতেই গোটা ছবিখানা বাঁ দিকে বাঁই বাঁই করে চরকির মত ঘুরতে আরম্ভ করল।

দুলাল আর হরষিত দুজনেই একটু পেছিয়ে এল, কারণ ছবিটা ঘুরতে ঘুরতেই দেয়াল থেকে এগিয়ে আসছে ঠিক তাদের নাক বরাবর।

ধীরে ধীরে ছবিটার ঘোরার গতি কমে এল, তারপর একসময় স্থির হয়ে গেল ছবিটা, সেইসঙ্গে দেয়ালের একটা অংশও যেন খুলে ঠিক ছোট্ট একটা দরজার চেহারা নিল।

সন্তোষবাবু বললেন, তোমরা আমার পেছনে এস।

দরজাটা মাটি থেকে আন্দাজ দু'ফুট মত উঁচুতে। সন্তোষবাবুর পেছন উঁচু চৌকাঠটায় চড়তেই দেখা গেল সরু একসার সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে।

সন্তোষবাবু এতক্ষণ তার লাঠিখানা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রেখেছিলেন। হরষিতকে বললেন সেটা নিয়ে আসতে। সেটা হাতে নিয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দ তুলে নীচে নামতে নামতেই দেয়ালের গায়ে লাগানো একটা সুইচ টিপে দিলেন সন্তোষবাবু। একসাথে অন্ধকার সুঁড়িপথটা সার সার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল।

বেশিক্ষণ নামতে হল না। একটু পরেই মাটির নীচের ঘরে পৌঁছে গেল সবাই।

ঘরখানা বিরাট আর তার ভেতর অজস্র থাম। পাথর আর কংক্রিটের মেঝে আর দেয়াল। ঘরের সর্বত্রই এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো বস্তা। হরষিত গুনে দেখল, মোট এগারোটা।

সন্তোষবাবুর নির্দেশে একটা বস্তার মুখ খুলতেই থ হয়ে গেল দুলাল। অজস্র পাঁচশো আর একশো টাকার বান্ডিল গার্ডার বাঁধা অবস্থায় থরে থরে সাজানো রয়েছে ভেতরে।

সন্তোষবাবু একটু লজ্জিতভাবে বললেন, সবই খুব এলোমেলো ভাবে রয়েছে। সোনাদানা আর হিরে অবশ্য সবটাই টাকা করে নেওয়া হয়েছে——বেশিরভাগই পাঁচশো টাকার নোট। এতে কাজ তাড়াতাড়ি হয় এবং দ্রুত।

মনে মনে বৃদ্ধের বুদ্ধির প্রশংসা করল হরষিত। যে সংগঠনের প্রাণই অর্থ তার জোগাড়যন্ত্রে দেরি হলেই তো সত্যিকারের অসুবিধে।

টাকার একটা বস্তার ওপর লাঠি ঠুকে সন্তোষবাবু বললেন, আমার দায়িত্ব আমি সঠিকভাবে পালন করেছি বলেই আমার ধারণা। এবার তোমাদের সময়। সব বুঝে শুনে নিয়ে আমাদের বাকি কাজগুলোকে শেষ কর আর সংগঠনকে বাঁচিয়ে যাও।

ক্লান্তভাবে একটা টাকার বস্তার ওপরই বসে পড়লেন সন্তোষবাবু। ঠিক তখনই মাথার ওপর থেকে চাপা একটা ধপ্‌ধপ্ শব্দ ভেসে এল। দুলাল বলল, দাদু, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে। সেটা সত্যি হলে.....

দুলালের কথা শেষ হল না। তার আগেই সিঁড়ির ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে নামল দুটো গ্যাসবোমা।

সন্তোষবাবু বললেন, কুইক, আমার পেছনে....

চোখের সামনে পৃথিবী দুলছে এমন অবস্থাতেও হরষিতের হাত ধরে কোনওভাবে ঘরের এককোণে প্রায় ছুটে এলেন সন্তোষবাবু। তারপর দেয়ালের গায়ে একটা কড়া ধরে টানতেই দেয়ালের ফোকরে বেশ ছিমছাম একটা ছোট্ট ঘর বেরিয়ে পড়ল।

ঘরটায় ঢুকেই এক কোণের একটা হাতলে টান দিতেই মূল ঘরটা থেকে ছোট ঘরটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সন্তোষবাবু বললেন, যেভাবেই হোক ওরা ওপরের হলঘরে এসে পৌঁছে গেছে। বোধহয় সহজ রাস্তাটাই নিয়েছে। নিশ্চয়ই একধার থেকে সকলকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছে। এমনকি সেটারও হয়ত দরকার হয়নি। আমার ধারণা ওরা সরাসরি মূল বাড়িটার ওপর আক্রমণ করেছে। আর এসেছে একেবারে সামনের গেট দিয়ে....

কথা বলতে বলতেই দেয়ালের গায়ে সাঁটা একটা কাঠের প্যানেল সরিয়ে দিলেন সন্তোষবাবু। বললেন, প্রয়োজনে লাগতে পারে মনে করে এখানে একটা চৌকো কাচ বসিয়ে রেখেছিলাম। ঘরের দিক থেকে দেখলে এটাকে একটা চৌকো পুরনো আয়না বলে মনে হবে। এটার ভেতর দিয়ে দেখতো ঘরের ভেতর কি হচ্ছে....

এক লাফে দুলাল সামনে এগিয়ে গেল। তার পাশাপাশি হরষিত। কাচের গায়ে চোখ লাগাতেই ওরা দেখল তিনটে কালো ব্যাগ নামিয়ে যন্ত্রচালিতের মত বস্তার মুখ খুলে টাকার বাণ্ডিল তুলে নিচ্ছে তিনটে লোক।

প্রত্যেকটা বাণ্ডিল পরীক্ষা করে পাঁচশো টাকারগুলো ওরা আলাদা করে নিচ্ছে। উঃ, কী বুদ্ধি! হরষিত আন্দাজ করে নিল, তিনটে ব্যাগে এগারোটা বস্তার মাল ঢোকানো অসম্ভব বলেই ওরা পাঁচশো টাকার বাণ্ডিলগুলো আলাদা করে নিচ্ছে।

ঠাসাঠাসি করে টাকাগুলো ব্যাগে ঢোকানোর পর হ্যাভারস্যাকের কায়দায় সেগুলোকে পিঠে তুলে নিল ওরা। প্রত্যেক্যের দু'হাতে তখন দুটো করে মারণাস্ত্র চলে এসেছে।

দুলাল আর হরষিতের অবাক চোখের সামনে থেকে রেকর্ড সময়ের মধ্যে লুকোনো টাকার সিংহভাগ সরিয়ে নিয়ে দুলকি চালে তিনজনই সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ঘরে উঠে গেল।

হরষিত বলল, আর এক সেকেন্ড নয়। চল, দুলাল।

সন্তোষবাবু অনুমোদনসূচক মাথা নাড়লেন।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওপরের হলঘরে পৌঁছে অস্ত্রগুলো ভাগাভাগি করে নিল দুলাল আর হরষিত। সন্তোষবাবু গুমঘরের ভেতর বাকি টাকার তোড়াগুলো ফের সাজাতে বসলেন।

চারদিক নিস্পন্দ। কোথাও মানুষজনের সাড়াশব্দ নেই। অথচ সন্ধে সবেমাত্র সাড়ে সাতটা। চারপাশে ঝিঁঝির আর আরো কতগুলো অদ্ভুত শব্দে হরষিতের মনে হচ্ছিল, এ যেন মৃতের গ্রাম। এ জায়গার এই অদ্ভুত চেহারা আগে কোনদিন দেখেনি সে। চতুর্দিকে যথাসম্ভব আলোয় আলো। তা সত্ত্বেও সব কিছুকে জড়িয়ে রয়েছে কুয়াশার জমাট চেহারা।

লনে পৌঁছে দুলাল হরষিতের হাত চেপে ধরল। বলল, এবার আমাদের একা হয়ে যেতে হবে, হরষিত। আমি যাব বাঁদিকে আর তুমি ডাইনে।

নিঃশব্দে মাঠের দিকে সরে গেল দুলাল। হরষিত পায়ে পায়ে ডানদিকে চলল।

খাওয়া দাওয়ার আয়োজন যেখানে করা হয়েছে সেই প্যান্ডেলটার নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য মানুষ। যে যেখানে ছিল সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এমনকি ভাতের পাতের ওপর প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে অসংখ্য মানুষ। দৃশ্যটা কিম্ভুতকিমাকার। গ্যাসটা কি বিষাক্ত?

চিন্তাটা মাথায় আসতেই সাদা হয়ে গেল হরষিত। রিভলবার সমেত ডানহাতটা অসম্ভব ভারি মনে হচ্ছে। এমনসময় পেছনে মৃদু পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল হরষিত। তার প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে কালো পোষাকে মোড়া একটা লোক।

একটুও সরবার অবকাশ পেল না হরষিত। তার আগেই তার পিঠের ওপর যেন নেমে এল এক পাহাড়। লোকটা একটু বেশিই কাছে ছিল। সে জন্যই আঘাতটা পুরো শক্তি নিয়ে নামেনি। তার জোরেই বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ল হরষিত, তারপর হিসেব করে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে

অসম্ভব চোট পেয়েছে এমন একটা ভান করে লোকটার মুখোমুখি হল। রিভলবারটা অবশ্য খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ে গেছে।

এসব আঘাতে যে কোনও লোকই মাটিতে শুয়ে পড়ে, কিন্তু ছেলেটার তেমন কিছুই হল না দেখে খুব অবাকই হয়ে গেল লোকটা। ধীরে ধীরে তার ডানহাতে উঠে এল একটা রিভলবার।

একটা অসহায়তা গ্রাস করে নিল হরষিতকে। জ্যাঠামশাইকে হয়ত এভাবেই যেতে হয়েছিল। চোখদুটো বন্ধ করে নিল সে।

দুম্ করে শব্দটা যখন নিজের কানে শুনতে পেল, হরষিত তখন চোখ খুলেও বুঝতে পারছেনা, কেন সে মরেনি। তার সম্ভাব্য আততায়ী তখন হাতখানেক দূরে নিজের মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কেউ একজন আড়াল থেকে একটা ক্রিকেট বলের সাইজের পাথর লোকটার মাথায় ছুঁড়ে মেরেছে। পাথরটা পাশেই পড়ে আছে। এই পাথরটার জন্যই লোকটার রিভলবারের গুলি তার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে।

হরষিত ঝুঁকে পড়ে লোকটাকে তোলার চেষ্টা করল। লোকটার মাথার পেছনে একখানা হাত গুঁজে দেবার চেষ্টা করতেই পা দুটিকে কুঁকড়ে পেটের কাছে এনে ভয়ংকর একখানা লাথি তার বুকের ওপর বসিয়ে দিল লোকটা। প্রচণ্ড আঘাতে এক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারাল হরষিত।

আহত লোকটা ওয়াই। মাথায় পাগড়ির মত একটা ফেট্টি বাঁধতে বাঁধতে সে চিন্তা করছিল হরষিতের গলায় ফাঁস দিয়ে একটা গাছে ঝুলিয়ে যাওয়ার। বাঁদরামির শাস্তি কি হতে পারে তার একটা উদাহরণকে চোখের সামনেই ঝুলতে দেখবে গ্রামবাসী। ভাল শিক্ষা হবে।

কোমরে জড়ানো নাইলনের একটা দড়ি পাকে পাকে খুলে নিয়ে যত্ন করে একখানা ফাঁস পরিয়ে নিল সে। তারপর হরষিতের গলায় সেটা গলিয়ে দড়ির আরেকটা প্রান্ত একটা গাছের ডালের ওপর ছুঁড়ে দিতেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি ছেয়ে গেল ওয়াই-এর মনে। আসন্ন মৃত্যুর কথা

জেনে ফেললে মানুষের এমন হয়। যে গাছটার নীচের ডালে ওয়াই তার দড়িটা ছুঁড়ে দিয়েছিল তারই ওপর থেকে মুহূর্তে আর একখানা দড়ির ফাঁস নেমে এসে তার গলায় এঁটে বসল।

মাথার আঘাতের ফলে হাত দু'খানাকে যতটা দ্রুত ভেবেছিল ততটা তাড়াতাড়ি কাজে লাগাতে পারল না ওয়াই। তার আগেই তার ভারি শরীরটা ছট্‌ফট্ করতে করতে শূন্যে উঠে গেল।

আস্তে আস্তে উঠে বসল হরষিত। শয়তানটার জোড়া পায়ের লাথি মিনিট খানেকের জন্য তাকে বিহ্বল করে দিয়েছিল। বুকে হাত বোলাল হরষিত। এখনো ব্যথা করছে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে। তারপর কোনওমতে সোজা হল। সামনের দিকে দৃষ্টিটা দিতেই দেখতে পেল তারনাক বরাবর দোল খাচ্ছে একজোড়া পা। ওপরের দিকে তাকাতেই লোকটার মুখ দেখতে পেল হরষিত। এই লোকটাই খানিকক্ষণ আগে তাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল।

কী করুণ দেখাচ্ছে এখন লোকটাকে। চোখদুটো মার্বেলের মত ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। জিভটা বিসদৃশভাবে ঝুলে পড়েছে বাইরে। কে মারল লোকটাকে অমন করে?

হাত দিয়ে দেহটাকে ছোঁবার চেষ্টা করল হরষিত। হঠাৎ শিসের মত একটা শব্দ হল কোথাও। আস্তে পিছিয়ে এল সে।

তার থেকে প্রায় হাত তিনেক দূরত্বে সটান দাঁড়িয়ে থাকা একটা জামরুল গাছের বাকলের খানিকটা উড়ে বেরিয়ে গেল। পুকুরের দিক থেকে সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়েছে কেউ। ভাবতে না ভাবতেই আবার গুলি। এবার হরষিতের জামার প্রায় হাতা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। একলাফে ঝোপের ভেতর পড়ে হ্যাঁচড় প্যাঁচড় করে বাড়ির সামনের দিকটায় ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল হরষিত। ছুটতে ছুটতেই একটা কথা মনে হল, একটা লোক যখন মারা গেছে তখন দলটায় জীবিত আছে আর মাত্র দুজন। দুলাল নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। কিন্তু লোকগুলো চোরাই মাল হাতে পেয়েও এতক্ষণে সরে পড়ল না কেন? বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়।

মনে মনে জোরালো আলোগুলোর প্রশংসা করল হরষিত। এই যে এতটা সময় সে যুঝে চলেছে এর কারণ বোধহয় এই আলোগুলোই। কিন্তু দুলাল এখন কোথায়? ভাবতে ভাবতে মেইন গেটের কাছাকাছি এসে পড়ল হরষিত। হঠাৎ একজোড়া জোরালো আলো তার শরীরের পেছন দিকটায় এসে পড়ল।

কাঁচা রাস্তা ধরে তারই দিকে এগিয়ে আসছে একটা মারুতি ভ্যান।

একটা গাছের আড়ালে সরে গেল হরষিত। গাড়িটা দাঁড়াল। সেকেণ্ড কয়েকের ভেতর তার দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল জনা পাঁচ-ছয় মুখোশধারী মানুষ। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই খুনী তিনজনের একজনকে ঘাড়ে নিয়ে একেবারে একরাশ আলোর মধ্যিখানে এসে আবির্ভূত হল দুলাল। বিকট একটা চিৎকার করে দুলালের দিকে দৌড়ে গেল হরষিত। সামনের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা কি ঘটতে চলেছে আন্দাজ করে নিয়ে কাঁধের লোকটাকে ঢাল বানিয়ে বারান্দার দিকে হটে গেল দুলাল। হরষিত এগিয়ে আতেই লোকটাকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়েই লাফ মেরে দুজনে বারান্দার পাঁচিলের আড়ালে চলে গেল। মুখোশধারী লোকগুলোর হাতে তখন উঠে এসেছে নানান মাপের একেকটা আগ্নেয়াস্ত্র।

বৃষ্টির ছাটের মত একরাশ বুলেট ছুটে এসেছে। নিমেষের মধ্যে দুলাল আর হরষিতের চোখের সামনে জমাট সিমেন্টের দেয়াল ফেটে ঝুরঝুর করে বালি সিমেন্টের গুঁড়ো খসে পড়তে আরম্ভ করল।

দুলাল বলল, আর নয়, হরষিত। এখ্খুনি বুকে হেঁটে পেছনদিকটায় চল।

অবরুদ্ধ স্বরে হরষিত বলল, কিন্তু, এদিক দিয়ে গেলে তো কেবল গুমঘর। বাড়ির কোলাপসিবল গেট আর দরজাগুলো তো এখন মরে গেলেও কেউ খুলবেনা। এই ডামাডোলে কে আর বুঝবে আমরা ধাক্কা দিচ্ছি।

দুলাল উপুড় হয়েই বলল, আর সময় নেই, গুমঘরেই নেমে চল।

হরঘরটার দরজা তখনও খোলা। হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকেই একখানা কাউচ দেখে হরষিত লাফিয়ে পড়ে সেখানাকে দরজার গায়ে

চেপে লাগিয়ে দিল আর দুলাল সেটার ওপর একটার পর ভারি জিনিস এনে চাপিয়ে দিতে আরম্ভ করল। আর একঝলক গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। থরথর করে কেঁপে উঠল ভারি দরজাটা।

সুড়ঙ্গপথে নামতে দুলাল বলল, সন্তোষবাবু আবার উঠে আসেননি তো?

হরষিত বলল, সেটা করার মত বোকামি করবেন না আশা করি। কিন্তু দরজাটা আমায় চিন্তায় ফেলছে।

ঘরখানায় আগের মতই আলো জ্বলছে। টাকার বস্তাগুলোও যথেষ্ট গুছিয়ে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত এক শৈত্য অনুভব করল হরষিত। কি যেন একটা পরিবর্তন এসেছে ঘরখানার ভেতর। বাঁদিকে তাকাতেই তার কারণটাও বুঝল সে।

ঘরখানার এককোণে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে রয়েছে সন্তোষবাবুর দেহটা। তার ছড়িটা একটু দূরে মাটির ওপর দেয়ালের সঙ্গে রেফ চিহ্নের মত খাড়া করা।

দুলাল অস্ফুটে বলে উঠল, যা ভয় করছিলাম তাই-ই হল। ওদের কেউ এখানেই লুকিয়ে দলের আর সবার জন্য অপেক্ষা করছিল, একলা সন্তোষবাবু পেরে ওঠেননি।

হরষিত সন্তোষবাবুর দেহের একদম কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। পড়ে থাকা শরীরখানা ছুঁতে সাহস হচ্ছে না তার। যদি জ্যাঠামশাইয়ের মত এঁরও কিছু......

দুলাল মাটিতে উবু হয়ে বসে সন্তোষবাবুর নাড়ি দেখল। খুব ক্ষীণ। তবু চলছে। কোন ভারি জিনিস দিয়ে মাথার একপাশে আঘাত করা হয়েছে। খানিকটা রক্ত বেরিয়ে মেঝের ওপর জমাট বেঁধে রয়েছে।

হরষিত বলল, কী....কী দেখলে?

দুলাল বলল, বেঁচে আছেন নিঃসন্দেহে। তবে একটা ব্যবস্থা না নিলে.....

—কোনও ব্যবস্থার দরকার নেই। যা করার আমি করছি। ঘরের একটা বিশেষ জায়গা থেকে ভেসে এল কথাটা। দুলাল বাঘের মত সেদিকটায় ঘুরে গেল। গ্যাসবোমার হাত থেকে রক্ষা পেতে যে ঘরটাকে ঘন্টাখানেক আগেই তারা ব্যবহার করেছে এখন তারই দেয়াল সরিয়ে মূল ঘরখানায় ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে আততায়ী তিনজনের একজন।

দুলালের হাত কোমরের দিকে চলে গেল। কিন্তু তার আগেই লোকটার হাতে উঠে এসেছে চকচকে একটা রিভলবার। খসখসে গলায় লোকটা বলল, যেখানে আছিস সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক দুজন। নইলে ঝাঁঝরা করে দেব।

দাঁতে দাঁত চেপে দুলাল বলল, এই বুড়ো মানুষটাকে মেরেছো কেন?

—আমাকে জেড বলে ডাকে সকলে, দেঁতো হাসল লোকটা, তারপর বলল, মারতাম না। কিন্তু গ্রামের বাইরে বেরোনোর রাস্তাগুলো যখন দেখলাম পুলিশ দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিস তখন ভাবলাম ফিরে গিয়ে বাকি মালগুলোর আর তোদেরও পাকাপাকি ব্যবস্থা করে যাই।

দুলাল খুব স্বাভাবিকভাবে জেডকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হরষিতকে বলল, তাহলে সুজিতবাবু সবই জেনেছেন—

হরষিত বলল, এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও করেছেন।

জেড্-এর সমস্ত মুখখানা রাগে লাল হয়ে গেল। হাতের রিভলবারটা একটু নেমে গেল। ছেলেগুলোর স্পর্দ্ধা দেখে তার অবাক লাগছে। কিন্তু জেড-এর এক মুহূর্তের অসতর্কতার ফায়দা তুলে নিল দুলাল। ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত তার শরীরটা শূন্যে উঠে গেল। সমস্ত দেহের ভার সে নামিয়ে দিল জেড-এর ওপর। জেড-এর হাত থেকে রিভলবারটা খসে পড়ল। তার বিপুল দেহটা আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর। পাশব আক্রোশে হরষিত একটার পর একটা লাথি কষাতে লাগল লোকটার শরীরে। তারপর লাফ দিয়ে উঠে সে হাঁটুদুটো তার পেটের ওপর নামিয়ে আনল। দারুণ শক্তিশালী লোকটার মুখ থেকেও যন্ত্রণার একটা 'কোঁক' ধ্বনি বেরিয়ে এল।

এরপর আর লোকটার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ানোর মত সুযোগ হল না। দুলাল আর হরষিত দু'পাশ থেকে শুরু করল। এলোপাথাড়ি মার। পাথরের মত শরীরের লোকটা নিজেকে মুছড়ে বারবার চেষ্টা চালিয়ে

গেল ওদের ছোঁবার। শেষ পর্যন্ত দুলাল পিঠের সাথে বাঁধা বেসবলের ক্লাবটা খুলে নিল। হরষিত দেখল, মহা আতঙ্কে বুজে আসছে জেড-এর

চোখদুটো আর তার মুখের চারদিকে বেড়ে চলেছে ক্ষত চিহ্নের সংখ্যা।

সন্তোষবাবুর ওপর পাশবিক আক্রমণ দুলালের মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। হরষিত দেখল, দুলালের চোখে খুনীর দৃষ্টি। ক্লাবটা বারবার আছড়ে পড়ছে জেড-এর হাঁটু আর কনুইয়ের ওপর। মিনিটখানেকের ভেতরই অজ্ঞান হয়ে পড়ল জেড।

ক্লান্ত যোদ্ধার মত হরষিতের দিকে তাকাল দুলাল। আবার একরাশ গুলির শব্দ শোনা গেল। গুপ্ত দরজার দিকে এগোবার আগেই হুড়মুড় করে পাঁচজন সশস্ত্র লোক সুড়ঙ্গপথে নেমে এসে ওদের ঘিরে ফেলল।

পিঠে বন্দুকের নলের ছোঁয়া লাগতেই হরষিতের মনে হল, এ দুঃস্বপ্ন কি আর শেষ হবার নয়?

দুলাল দুঃখের স্বরে বলল, গন্ডগোলে টাকাগুলোর কথা আর মনে নেই। আবার যদি সম্ভব হয় সবকিছু একজায়গায় করতে হবে, নইলে——এখানেই সব শেষ।

হরষিত দেখল, দুজন জেড-এর দেহটা সোজা করে দাঁড় করিয়ে তার পিঠ থেকে টাকার বোঝাটা খুলে নিচ্ছে। জেড-এর অবশ শরীরটা এলিয়ে পড়ছে বারবার।

এই লাশ সুড়ঙ্গপথে ওপরে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর ভেবেই বোধহয় বাইরের পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য একজন সশস্ত্র লোক সকলের আগে ওপরে উঠে গেল। তার পেছনে হরষিত আর দুলালের পিঠে বন্দুক ঠেকিয়ে নিয়ে চলল আর দুজন। বাকি দুজন জেডের শরীরটা বয়ে নিয়ে পেছনে আসতে আরম্ভ করল।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে হলঘর ছাড়িয়ে বাড়ির সামনে বেরিয়ে আসতেই দুলাল আর হরষিত দুজনেরই চোখে পড়ল লাশটা। এক্স-এর শরীরটা বিসদৃশভাবে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তারই সঙ্গীদের গুলিতে। দুলাল কেবলমাত্র তাকে অজ্ঞান করে কাঁধে বয়ে নিয়ে এসেছিল।

পাঁচজন লোক একটু আগেও মৃতদেহটা দেখে গেছে। তাদের মুখে

কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। পেছনের দুজন জেডকে মাটির ওপর শুইয়ে রেখে তাড়াতাড়ি গুমঘরে ফিরে গেল। ওদের একজন ঘড়ি দেখে জোরে শিস দিল। হরষিত আর দুলালের চোখের সামনে কুয়াশার মেঘ কাটিয়ে মারুতিটা এসে দাঁড়াল একদম বাগানের মধ্যে। ততক্ষণে বস্তা বস্তা টাকা বারান্দায় সাজিয়ে রাখছে অন্য লোকগুলো। একজন এক্স-এর মৃতদেহটা উপুড় করে পিঠের ব্যাগটাও খুলে নিয়েছে।

দুলাল আর পারল না। তার চোখ দুটো জলে ভরে এসেছে। ধরা গলায় সে বলল, হরষিত, গোটা গ্রামে কি আমরা মাত্র এই দুটো ছেলেই লড়ছি! সুজিতবাবু থাকতেও এরা গ্রামে ঢুকল কি করে?

পাঁচজনের একজন ফিরে তাকাল। বলল, ইন্সপেক্টারের কথা বলছিস? কনস্টেবলদের সঙ্গে আরামে ঘুমোচ্ছে।

——আবার গ্যাসবোমা! হরষিত বলল।

লোকগুলো এক এক করে বস্তাগুলো মারুতির পেছনে তুলে ফেলেছে। বাকি আর মাত্র দুটো বস্তা।

হরষিত দেখল, সামনের লোকটা খুব স্বাভাবিকভাবে হোলস্টার থেকে একটা রিভলবার বার করে এনেছে। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। দুলালের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, প্রথম লোকটাকে কে মেরেছিল বলতো?

——আমি। গাছের ওপর থেকে তোমার ওপর আমিই নজর রাখছিলাম। তবে, পাথরটা আমি ছুঁড়িনি। ওটা কোত্থেকে লোকটার মাথায় এসে লাগল সেটা বলতে পারব না।

——আমি বলতে পারি। ছাদের ওপরের কোনও একটা জায়গা থেকে কথাটা ভেসে এল।

পাঁচ বন্দুকধারী মুহূর্তে ছাদের দিকে বন্দুক নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। সামান্য সময়ের জন্য দুলাল আর হরষিতের দিকে কারোর দৃষ্টি রইল না।

ছাদের ওপর অন্ধকারে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তা সত্ত্বেও মিনিট

তিনেক সেদিক লক্ষ্য করে একটানা গুলি চালিয়ে গেল লোকগুলো। ঠিক তার পরেই, হরষিত দেখল, আকাশ থেকে বিচিত্র একটা কিছু নেমে আসছে। লোকগুলোর মাথার ওপর।

জিনিসটা মোটা নাইলনে বোনা বিরাট একটা জাল। সোজা এসে লোকগুলোর মাথার ওপর নামল সেটা। একলাফে হরষিত আর দুলাল দুজনেই সরে গেল। কিন্তু, গুন্ডাগুলোর কেউই সরতে পারেনি, কেননা ততক্ষণে তাদের মাঝখানে এসে পড়েছে একটা গ্যাসবোমা। তাড়াহুড়ো করে একবার শেষ চেষ্টা করল ওরা। তারপর জালের ঘেরাটোপের ভেতরই অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

হরষিত হাততালি দিয়ে চিৎকার করে বলল, সব শেষ। আমরা জিতেছি। দাদুকে এবার গিয়ে তুলি।

দুলাল ছাদের দিকে তাকিয়ে বলল, বাপন জিন্দাবাদ। আমাদের দলটা এবারকার মত সত্যিই বেঁচে গেল।

বাপন ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, ভাগ্যিস, প্রথম লোকটার মাথায় পাথর মারার পর তোমরা চলে গেলে বোমাটা সরিয়ে রেখেছিলাম।

—আর খেলার মাঠের বোমগুলো? মানে, চকোলেট বোমগুলো? দুলাল জিজ্ঞেস করল।

—বাপন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলে, আমি.....আমি। সব আমার কাজ।

—কিন্তু কেন? বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে হরষিত প্রশ্ন করে।

বাপন গম্ভীরভাবে বলে, আমি চেয়েছিলাম ইন্সপেক্টার সুজিতবাবু কাছাকাছি থাকুন। আসলে দাদুই আমাকে সব বলে রেখেছিল। দাদুর কথামতই মা আমাকে অধীরদার ঘরে লুকিয়ে রাখে। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখলাম পাড়ার তিনটে মুখই পুলিশ দিয়ে আটকে দিয়েছেন সুজিতবাবু।

—সুজিতবাবুর বিখ্যাত সন্দেহ! দুলাল মন্তব্য করল।

—এদিকে এদের কাছে আর গ্যাসবোমা নেই.....শেষটা আবার

আমার কাছে। তাই এরা বোধহয় আর বেরোতে পারেনি। তারপর আবার নতুন দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢুকল, আর.....

বাপনের কথাটা শেষ হল না, দুলাল বলে উঠল, আর....কাটা সৈনিক হিসেবে এখন এদের কী চমৎকারই না দেখাচ্ছে!

সমাপ্ত

বেড়াল

মফঃস্বলে রহস্যঘন এক পরিবেশে জনাকয়েক তরুণী এক মহিলার কঙ্কালের সঙ্গে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে থাকা বেশ কয়েকটা মৃত বেড়াল আবিষ্কার করে বসল। কিছুদিন পর বিচিত্র এক যুবক তার বেড়ালের দল নিয়ে আক্রমণ করল তাদের বাড়ি........

এই পুরনো মফস্বল সরকারবাগান নামের অঞ্চলটায় জগদীশবাবুর চাইতেও প্রাচীন বাড়ি আর মাত্র একখানাই আছে। সেই দোতলা বাড়িটা জগদীশবাবুর প্রাসাদের মত বিরাট বাড়ির লাগোয়া মাঠটার গা ঘেঁষে এতদিন অনাদরে পড়েছিল। বাড়িটা ভুতুড়ে। পাশের মাঠটাও কেমন যেন ন্যাড়া, প্রাণহীন। দুটো খেজুর গাছ রয়েছে মাঠটার দু'কোণে। রসের খোঁজে পাড়ার ছেলেরা বেশ কয়েকবছর সে দুটোর ওপর ব্যর্থ হামলা চালিয়েছে। ব্যর্থ এই কারণে যে, মাঠের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই যেন গাছ দুটো বিলকুল শুকনো।

এ অঞ্চলে সবারই প্রায় বাগানবাড়ি। নগরজীবনে ক্লান্ত. বনেদী মানুষেরা সম্ভবত একটু সবুজ আশ্রয়ের সন্ধানে এখানে অপেক্ষাকৃত সস্তাদরে অনেকটা করে জমি কিনে মনের মত বাড়িঘর তুলে নিয়েছেন। এদের ভেতর পূর্ববঙ্গীয় মানুষদের সংখ্যাধিক্যই চোখে পড়ে।

যেহেতু স্টেশনের পুবদিকের এই পাড়াটায় স্তব্ধতা এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সেহেতু ভূতুড়ে বাড়িটা সম্বন্ধে কিছুটা এলোমেলো স্থানীয় কৌতূহল ছাড়া আর কিছু ছিল না। জগদীশবাবুর নিজের ধারণাও এক সময় এ'রমই ছিল। কিন্তু একদিন তার নাতনী শিবানী ঐ বাড়ির ব্যাপারেই তাকে এমন একটা পরিস্থিতির ভেতর টেনে নিয়ে গেল, যে তিনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

শিবানী তখন মাধ্যমিক দেবে দেবে করছে। টেস্টের রেজাল্ট বেরোবার পর এক বিকেলে সে তার কয়েকজন বান্ধবী নিয়ে পাশের মাঠটায় বসেছিল। অনু, শ্বেতা, শুভ্রা, মানসী—শিবানীর প্রত্যেক বান্ধবীই এখানকার একেকটা মার্কামারা খানদানী ঘরের মেয়ে। পড়াশোনাতেও সকলেই যথেষ্ট ভাল। শিবানী অনুকে 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড হার পিপ্‌ল' গ্রুপটায় নম্বর বাড়াবার কায়দাকানুন শেখাতে গিয়ে দেখল, অনু বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে।

শিবানী একটু অবাক হয়ে বলল, কি রে অনু কি ভাবছিস অত?

অনু মাটির দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল কে জানে। মুঠোয় খানিকটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে চোখ না তুলেই বলল, এই মাঠটায় এসে বসলেই আমার কেমন একটা হয়। মনে হয়, ঐ বাড়িটা থেকে কেউ আমাকে দেখছে।

মানসী বলল, উঃ! তুই বড্ড কল্পনাপ্রবণ রে! অবশ্য এতে তোরই সুবিধে। ইংরাজী, বাংলা দুটোতেই বরাবরের মত হায়েস্ট—

শিবানী চোখ টিপে মানসীকে মাঝপথে থামিয়ে বলল, এই সো কল্ড ভূতের বাড়ি থেকেও কেউ যদি তোকে দেখে থাকে তাহলে বলতে হবে, এটা সত্যিই আমাদের নলেজের বাইরের ব্যাপার। কেননা, আজকাল তোকে সবাই-ই এত বেশি দেখে ফেলছে যে—

কথাটার পাশ কাটিয়ে অনু বলল, ভাবছিস বোধহয় ইয়ার্কি করছি, তাই না? কিন্তু বিশ্বাস কর। এ দিকটায় তাকালেই আমার এ'রম হয়।

অনুদের বাড়িটা যেখানে সেখান থেকে এই ভূতুড়ে বাড়িটাকে অদ্ভুত দেখায়। দুটো পুকুর রয়েছে বাড়িটার ঠিক পেছনে। সে দুটোকে মনে হয় কোন নারীর প্রশস্ত দুটি চোখ। তার মাঝখান থেকে সরু একটা রাস্তা হুবহু একটা নাকের মত নেমে গিয়েছে। সে নাকে যদি সত্যি কোন নথ পরানো থাকত তাহলে মনে হত বাড়িটা যেন ঠিক ঐ নথের জায়গাটাতেই বসানো আছে। অবশ্য এর সবটাই অনুর কল্পনা। বন্ধুর কাছে শোনা সেই কথাটা হঠাৎ মনে পড়তেই আড়চোখে বাড়িটা একবার দেখে নিয়ে মুচকি হাসল শিবানী।

অনু গম্ভীরভাবে বলল, বিশ্বাস করছিস না বোধহয়?

শুভ্রা তড়বড় করে কথা বলার জন্য বিখ্যাত। সে বলল, কি করে বিশ্বাস করি বল! তোর বাড়ি থেকে তো চব্বিশ ঘণ্টাই এ বাড়িটা দেখা যায়। তাহলে তুই কি সারাদিন অন্ধ হয়ে থাকিস?

অনু আরেকটু যেন বিষন্ন হয়ে পড়ল। বলল, অনেকটা তাই। তবে পড়ার ঘরের ওখান থেকেই এদিকটা সবচেয়ে পরিষ্কার দেখা যায় বলে মা জানলাগুলোয় বড় বড় পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। আবার বাবাকে বলেছে, ষোল বছর হল। এ সময় বাজে হাওয়া গায়ে লাগলে ওর সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শ্বেতা বলল, মাসীমা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বলেছেন। ওসব হাওয়া টাওয়ায় আর আজকাল আমাদের কিছু হয়না। আর তাছাড়া, এত আলোচনার তো কিছু নেই। সোজাসুজি বাড়িটায় ঢুকেই দেখিনা—

শুভ্রা বলল, দাঁড়া! চ্যালা কাঠ-টাঠ দু'একটা কুড়িয়ে নিই। ভেতরে সাপ খোপ থাকতে পারে।

অনু প্রথমটায় ইতস্তত করছিল। শিবানীর দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে সে উঠে দাঁড়াল। অন্যরা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

শুভ্রা কোত্থেকে একটা বাঁশের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে এসে বলল, চ।

মরচে ধরা লোহার গেটটার দু'পাশের দুটো জামরুল গাছকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকা অর্কিড গাছগুলো বিশ্রী জট পাকিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে মানসী বলতে বাধ্য হল, দ্যাখ! মনে হচ্ছে, গাছগুলো যেন আমাদের বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিতে চায়না!

কথাটা শোনামাত্রই অনু মানসীর দিকে তাকাল। শিবানী তাকে বলল, তোর চোখমুখের যা অবস্থা দেখছি— লোকে না বলে, মেয়েটাকে ভূতে পেয়েছে!

শিবানীর কথাটা না শোনার ভান করে দড়ির মত লতানো অর্কিডের জাল টপকে কয়েক ফুট এগিয়ে গেল অনু। শুভ্রার শরীরটা ছোটখাটো। তার পা দুটো যেন বারবার টেনে ধরছিল গাছগুলো। সে প্রায় লাফ দিতে

দিতে জায়গাটা পেরোল। শ্বেতা, মানসী আর শিবানী তখন বাড়িটার বারান্দায় গিয়ে উঠেছে।

শিবানী লক্ষ্য করল, অনুকে বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে এখন। একটু বেশিই স্বাভাবিক, সেই সাথে তার মুখে একটা চাপা আনন্দের ছোঁয়াও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এত অল্প সময়ের মধ্যেই ওর এই পরিবর্তনে অবাক লাগল শিবানীর।

বারান্দা থেকেই কাঁঠাল কাঠের বিরাট একটা পাল্লা ভাঙা দরজা ঠেলে শিবানীরা সরাসরি বাড়িটার সামনের ঘরে এসে পড়ল।

শ্বেতা বলল, গঙ্গার ধারে ফরাসী আমলের যে বাড়িটায় আমরা গতবার গেলাম এটা অনেকটা সে'রম না?

শুভ্রা ঝংকার দিয়ে বলল, তোর মুণ্ডু! সে বাড়িটার দেয়ালে গাদা গাদা পুরনো বোতল ঝোলানো ছিল আর থামগুলো এ বাড়ির থেকে অন্তত দু'ফুট করে মোটা।

শ্বেতা মুখখানা অভক্তির সাথে কুঁচকে বলল, আচ্ছা বাবা। না হয় ভুলই করেছি। কিন্তু এ ঘরটা দেখে ভৌতিক কোন অনুভূতি জাগছে কি? কিরে, অনু?

একটা বড়সড় সাধারণ ময়লা গোছের পরিত্যক্ত ঘরের ভেতর বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে অনুরও সম্ভবত নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল। সে শিবানীকে বলল, নে নে। বেরিয়ে যাই, চল্। মিছিমিছি সময় নষ্ট। আমারই দোষ। অল্পেই ঘাবড়ে যাই।

মানসী আর শুভ্রা বলল, সে কি! দোতলাটা না দেখেই চলে যাব?

শ্বেতা বলল, অন্ধকার হয়ে আসছে। এসব দোতলা-টোতলা আর আজ দেখার দরকার নেই।

শিবানী কিছু একটা ভেবে জোরাল গলায় বলল, না না। সে সব হবে না। অন্তত আর একটা ঘর আমাদের দেখতেই হবে।

—দেখতে হয় তুই একা যা। আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। অনু শিবানীকে বলল। তার মুখচোখের অবস্থা আবার খারাপ হয়ে এসেছে।

শুভ্রা ঘরের ভেতর লাগোয়া একখানা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজাটা সরাসরি আরেকটা ঘরে ঢোকার। কিন্তু, একটা ঢাউস মান্ধাতা আমলের তালা সেটার কড়া দুটোয় আটকানো। শুভ্রা হাতের বাঁশের টুকরোটা তালার ফাঁকের বদলে একটা কড়ায় ঢুকিয়ে চাড় দিতেই কড়াটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়ে দরজাটা খুলে দিল।

মনে মনে শুভ্রার বুদ্ধির তারিফ করল শিবানী। ঐ পেল্লায় তালা খোলার শক্তি তাদের কারোরই নেই।

পায়ে পায়ে আধখোলা দরজাটার কাছে এগিয়ে গেল সবাই। তারপর হঠাৎই এক ঝলক দমকা হাওয়া এসে সপাটে দরজার দুটো পাল্লাই খুলে দিল, সেই সঙ্গে একটা বিকট আর্তনাদ করে চৌকাঠের ওপরই আছড়ে পড়ল অনু। বাকি সকলে তখন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঘরের ভেতর তাকিয়ে রয়েছে।

২

হিমেল রোদে একটা আরামকেদারায় শরীর বিছিয়ে আরাম করছিলেন জগদীশবাবু। পাশে একটা তেপায়া টুলের ওপর একটা দাবার বোর্ডে মনোযোগ দিয়ে ঘুঁটি সাজাচ্ছিলেন মনোতোষ বড়াল। মনোতোষবাবু জগদীশবাবুর তিরিশ বছরের বন্ধু। তাদের দুজনের দাবাখেলার বয়সও তিরিশ বছর।

ঘুঁটি সাজান শেষ করে বন্ধুর দিকে চোখ তুলে তাকালেন মনোতোষ। আজ ভীষণ অন্যমনস্ক লাগছে জগদীশকে।

মনোতোষ পকেট থেকে এক নম্বর বয়রা বিড়ি বার করে লাইটার দিয়ে সেটা ধরিয়ে জগদীশকে বললেন, আজ কিছু হয়েছে নাকি?

—কই না তো। অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন জগদীশ।

—তাহলে এ'রকম প্যাঁচার মত মুখ করে বসে আছিস কেন?

—একটা কথা ভাবছি। আসলে ক'দিন ধরেই চিন্তাটা মাথায় ঘুরঘুর করছে।

—কোন পারিবারিক ক্যাঁচাল নাকি? মনোতোষ বেশ উৎসুক হয়ে উঠলেন।

—ধ্যুস্। আমার বাড়ির ঝামেলা তো কেবল সকলবেলার বাজার পর্বে। ওসব নয়, আসলে পরপর দু'রাত একই স্বপ্ন দেখলাম, তা'ও আবার একই বাড়ি নিয়ে।

—বাড়ি! কোন বাড়ি?

—মাঠের পাশের ঐ বাড়িটা।

—ওঃ, আবার সেই কেস! ও তো গঙ্গা পার হয়ে গেল।

—গঙ্গা পার হল মানে?

—পঞ্চায়েত অফিসে গেছলাম গত হপ্তায়। নিমাই মোদক ঘুরঘুর করছিল, বোধহয় নতুন কোন দালালির ধান্দায়। আমায় দেখে বলল, খুড়ো,

ভূতের বাড়িটা এমন একটা পার্টি কিনে নিল—তোমরা পাড়ায় থাক, একটু আগেভাগে জানাতে পারলে না!

আমি বললাম, জানালে কি করতিস?

ও বলল, পার্সেণ্টেজ পেতে! তাছাড়া পার্টি বোঝ? দশ লাখ দিয়েছে ও'রকম একটা ঝুল বাড়ির জন্য।

বললাম, কোথাকার লোক। দলিলপত্তরই বা পেল কোত্থেকে?

ও বলল, কলকাতার লোক। ইয়াং। মালিকেরা তো ওখানেই থাকে। কাগজপত্তর ওখান থেকেই জোগাড় করে নিয়েছে।

জগদীশবাবু চোখ দুটো বুজে তার শরীরটা আরো খানিকটা পিছিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার স্বভাব আমার জানা, মনোতোষ। তুমি নিশ্চয়ই আরেকটু তদন্ত করেছ। মালিকের নামটা বল দিকি?

মনোতোষের চোখ দুটো যুগপৎ সরু ও সতর্ক হয়ে গেল। তিনি বলেলেন, নামটা অদ্ভুত; তুমি নানা জিনিষ নিয়ে কারবার কর। তোমার শোনা দরকার। একক। অবাক হচ্ছ তাই না! পদবীটা শুনবে? মার্জার। কোনদিন শুনেছ এ'রকম কোন পদবীর কথা।

উত্তেজনার সময় দুই বন্ধুই 'তুই' ছেড়ে 'তুমিতে' উঠে যান। আজও সে'রমই ঘটেছিল। তবুও মনোতোষের মুখের ওপর দুষ্টুমির ছায়া চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিল জগদীশের। তার ঠোঁটের ওপর উদগত হাসির আভাস লক্ষ্য করেই আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি শুকনো গলায় বললেন, কি পদবী বললে?

জগদীশবাবুর হাবভাব দেখে যেন ভীষণ অবাক হয়ে যাচ্ছেন এমন একটা ভঙ্গীতে মনোতোষ জবাব দিলেন, মার্জার। কেন বলতো?

—মার্জার! জগদীশবাবু আর পারলেন না। বন্ধুর চেয়ারের কাছে গিয়ে তার কাঁধ দুটো বলিষ্ঠ হাতে ধরে বললেন, মার্জার শব্দটার মানে জান?

—জানব না কেন? বেশ একটু বিরক্তভাবেই জবাব দিলেন মনোতোষবাবু। বললেন, ঢেঁকি, গড়গড়ি— কত পদবীর কথা শুনলাম, আর এ তো মার্জার! হতেই পারে। ওর মানে তো বেড়াল, তাই না?

—ঠিক। জগদীশবাবুর গলাটা যেন একটু ধরে আসে। মনোতোষবাবুর দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আরামকেদারাটার কাছে ফিরে যান। শরীরটা টানটান করে সিধে হয়ে বসে পড়েন। ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলেন, ও বাড়িতে ঘটে যাওয়া এক সময়কার একটা ঘটনার সাথে এই পদবীটার একটা যোগাযোগ লক্ষ্য করছ না? তোমার, আমার দুজনের নাতনীই তো জড়িত ছিল—

—ওঃ! চমকে উঠলেন মনোতোষ। বললেন, আমি তো সে সময় দেওঘরে ছিলাম(—তুই জানিস। তবুও যতটুকু শুনেছিলাম গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। অদ্ভুত ব্যাপার—

—অদ্ভুত নয়, বল ভয়ংকর।

—আরেকবার সবটা বলত। এদিকটায় থাকলে আমি নিজেই হয়ত সরেজমিনে তদন্ত করতাম।

কথাটা যেন শুনতে পেলেন না জগদীশবাবু। বললেন, তোমার নাতনী শুভ্রা আর আমাদের শিবানীর সাথে অনু, শ্বেতা আর মানসীও ছিল। অনুকে সেদিন সারাক্ষণই নাকি আনমনা দেখাচ্ছিল। ও নাকি বলেছিল, ঐ বাড়িটার ভেতর থেকে কে নাকি ওকে দেখে। অনেকটা সেই কারণেই মেয়েরা ওই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে। কাজটা একটু হঠকারীর

মত হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু, লোকালয়ের ঠিক মাঝখানে একখানা পোড়ো বাড়ি দেখলে বাচ্চারা উৎসাহিত হবেনা এটাও ভাবা যায়না। ভেতরে যে ঘরটায় ওরা প্রথমে গিয়ে ঢোকে সেটা দেখে ওরা খানিকটা হতাশই হয়। একদম সাদামাটা ঘর। কোন রহস্যই নেই। কিন্তু, তার ঠিক পরের ঘরেতেই—

—আমার সব মনে পড়ে যাচ্ছে। শুভ্রাই বোধহয় দরজাটার তালা ভাঙ্গে।

—ঠিক। দরজাটা খুলতেই কিছু একটা দেখে অনু অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সকলে ভালভাবে ভেতরে তাকায়। মরা সূর্যের আলো এসে পড়ছিল স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে একেবারে ঘরের ঠিক মধ্যিখানটায়। সেখানে একটা ইজিচেয়ারে শুয়েছিল একটা কঙ্কাল। পরনে শাড়ি। কঙ্কালটার ঠিক সামনে পেছনে দু'পাশে এমন কি ঘরের আরো নানাদিকে সিলিং-এ লাগান হুক থেকে নেমে এসেছে অজস্র সিল্কের দড়ির ফাঁস। প্রতিটি ফাঁসে আটকান একেকটা মৃত বেড়াল। সেগুলো তাদের শুকনো শরীর আর যাবতীয় বীভৎসতা নিয়ে দোল খাচ্ছে ইজিচেয়ারে শায়িত কঙ্কালটার মুখের চারপাশে। সেই অদ্ভুত আঁধারিতে এ'রম একটা অপার্থিব ব্যাপার দেখার পর ওদের আর সাহস হয়নি ওখানে দাঁড়ানোর। অজ্ঞান অনুর দেহটা কোনমতে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে দৌড়ে মাঠ পর্যন্ত পৌঁছেই চীৎকার চেঁচামেচিতে ওরা লোকজন জড়ো করে ফেলেছিল।

—তুই কি করলি তখন? মনোতোষ সহজ হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন।

—আমি তো তখন নিশ্চিন্ত মনে স্টেশন চত্বর থেকে পায়চারী করে ফিরছি। মাঠের ভেতর তখন জনা কুড়ি-পঁচিশ মেয়ে পুরুষের ভিড়। অনু তখন জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসেছে। ওর মা'ও খবর পেয়ে এসে পড়েছেন। মেয়ের অবস্থা দেখে তো মহিলা হাঁউমাঁউ করে কেঁদে ফেললেন। আমরা সবাই অনুকে তাড়াতাড়ি ওঁর সাথে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। তারপর

শিবানীর কাছে সব শুনে ওদের সকলকে বাড়ি যেতে বললাম। ততক্ষণে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক।

আমাকে ডেকে ছেলে ছোকরার দল বলল, দাদু, কি করা উচিত আপনিই বলুন।

ভিড়ের ভেতর শেখর ছিল। আমাদের মহিমদার নাতি, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ছেলেটার। ওকে বললাম, যা কিছু করার একটু ভেবেচিন্তে কোর। এখানে ব্যাপার যা শুনলাম তাতে পুলিশ ডাকার দরকার আছে এবং সেটা এখনই। তুমি এদের সঙ্গে জায়গাটার ওপর নজর রাখ। যা যা দেখার আশাকরি দেখে এসেছ। আমি বরং সকালে যা দেখার দেখব, তার আগে বাড়ি থেকে থানায় একটা ফোন করে দি।

মনোতোষ এতক্ষণ নিবিষ্টভাবে জগদীশের কথা শুনছিলেন। যেন ঘুম থেকে সহসা কেউ জাগিয়ে তুলেছে এমন একটা ভঙ্গীতে তিনি বন্ধুকে বললেন, কঙ্কালটা যখন সকালবেলা তোরা বার করলি তখন নাকি থানার লোকজনও ঘাবড়ে গিয়েছিল?

জগদীশবাবু পাংশুমুখে বললেন, নারকীয় ব্যাপার। সিল্কের দড়ি কেটে বেড়ালগুলোকে যখন নামান হল তখন সবারই মনে হয়েছিল, বেড়ালগুলোর শুকনো খটখটে শরীরেও চোখগুলো আশ্চর্য রকমের জীবন্ত। এছাড়া কঙ্কালটার গঠনটাও সৃষ্টিছাড়া। মানুষের হলেও পলিথিনের সীটের ওপর যখন সেটা রাখা হচ্ছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল কোন চতুষ্পদের দেহাবশেষ আমার চোখের সামনে মেলে ধরা হল। আমার দৃষ্টিভ্রম হতে পারে, কিন্তু উপস্থিত সকলের মুখেই যখন আঁধার ঘনিয়ে এল তখন বুঝলাম সবারই মনে আশঙ্কার মেঘ জমছে। কোন একটা অলীক সর্বনাশের অপেক্ষায় যেন আছে সকলে। ঠিক ঐ সময়েই ও'রকম গুমোট একটা পরিবেশের ভেতর যখন 'মিউ' করে ছোট্ট একটা শব্দ হল তখন তার প্রতিক্রিয়া হল বাজ পড়ার মতই মারাত্মক।

ভিড়ের ভেতর এইটুকুন পুঁচকে একটা বেড়াল! ডাকটা একটা ঠাট্টার মত তারই গলা থেকে বেরিয়ে এসেছে। আরো বার কয়েক মোলায়েমভাবে ডেকে সেটা সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ধীরে ধীরে সেই বাড়িটায় ঢুকে গেল।

বাড়িটাতে যা যা ঘটেছে তার পেছনের কারণ কি আমার জানা হয়নি। কঙ্কালটা কার, বা কতগুলো ফাঁসি যাওয়া বেড়ালের সাথে কি কি আধিভৌতিক ব্যাপার জুড়ে থাকতে পারে সেসব জানার প্রবৃত্তিই কারো হয়নি। কেবল জানা গিয়েছিল, কঙ্কালটা কোন নারীর যার শরীরের গঠনটা একটু অদ্ভুত। শুকিয়ে যাওয়া বেড়ালগুলোর সঙ্গে বহুদিন সেটা যে ঐ ঘরেই তালাবন্দী অবস্থায় পড়েছিল এ ব্যাপারটাও নিশ্চিন্ত। কিন্তু মহিলাটির কঙ্কাল অথবা তার সঙ্গে মৃত বেড়ালগুলো ওখানে কি করে এসেছে সেসব কিছু আমি জানতে পারিনি।

—তোমার বা আমার জীবদ্দশায় তো ওখানে কোন লোক দেখলাম না!

—যা বলেছ। সবটাই অদ্ভুত। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার ছোটবেলায় আমি বাড়িটাকে নতুন দেখলেও কোন লোক কখনও ওখানে দেখিনি। তারপর, থাকতাম হস্টেলে। কে অত ঝামেলায় যায়। তখন তো এখানে এ'রম কত বাড়ি তালাবন্দী অবস্থায় পড়ে থাকত।

—হুঁ। তোমার দোষ নেই। এখনও তো পালা পার্বণ ছাড়া এখানকার অনেক বাড়িই সারা বছর ফাঁকা পড়ে থাকে।

—কি করে বুঝব বল ও'রম একটা জায়গায় কোন অপকর্ম্ম চলছে।

—ছ' ছটা বছর কেটে গেছে, তাই না? নাতনীগুলো সবাই দেখতে দেখতে গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেল। ওরা সবাই মিলে সেদিন উদ্যোগ নিয়ে

আবিষ্কার না করলে এতবড় একটা ব্যাপার ধামাচাপা পড়ে থাকত। কিন্তু, কঙ্কালটা—

হঠাৎই অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন জগদীশবাবু। সেই সঙ্গে এতক্ষণের 'তুমি' আবার 'তুই'য়ে নেমে এল। বন্ধুর কথার সুতো ধরে তাকে বললেন, আশ্চর্য দ্যাখ—একটা আস্ত কঙ্কাল। মানুষ তো বটে! আর—অতগুলো মা ষষ্ঠীর বাহনেরই বা ও'রম দশা কেন করা হল সেটা আমার আজও মাথায় ঢুকল না।

—আমিও তো সেই কথাই বলতে চাইছি। অনেকদিন আগেকার ব্যাপার হলেও ঘটনাটা ঘটেছিল কেন এ প্রশ্নটা থেকেই যায়।

—হ্যাঁ, কেন?

সামান্য সময় চুপ করে থাকলেন দুজন। মনোতোষই স্তব্ধতা ভেঙে বললেন, বৌমারা আজই আসছে, না?

—হ্যাঁ। উইক এন্ড ছাড়া তো প্রকাশের সুবিধে হয় না। এবার শিবানীদের রেজাল্ট আউট হয়ে যাওয়ায় কয়েকদিনের এক্সট্রা ছুটি পেয়েছে। পুরোটাই এখানে কাটাবার ইচ্ছে। আমার আর এ বয়সে ওখানে যেতে মন চায়না। দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই—

—ওরা কি এবারও গাড়িতে আসবে?

—অ্যাম্বাসেডারখানা বদলে একখানা সুমো নিয়েছে ওরা কিছুদিন। প্রকাশ নিজেই ড্রাইভ করে আনবে। শিবানী এ চান্সটা কোনদিন ছাড়ে না। মানে—এ চত্বরে ওর মত যে ক'জন কলকাতায় পড়াশোনা করে সবাই-ই তো এ সময়ে এখানে চলে আসে। ওর বয়সে হইচই করে থাকাটাই স্বাভাবিক। আমারও মন্দ লাগে না। কটা দিনের জন্য বয়সটা ভুলে যাই।

—যা বলেছিস। আলটপ্‌কা একবার বলে ফেলেছিলাম বোধহয়, শিবানীরা আজ আসতে পারে, তো আসার আগেও দেখে এলাম শুভ্রা কষে মাঞ্জা দিতে আরম্ভ করেছে। তুই বরং দশরথকে চা দিতে বল। আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে ওর উৎসাহটা আরো একটু বাড়িয়ে দিই গে।

—এঃ হে! বড় ভুল হয়ে গেছে তো। কথায় কথায় চায়ের মত একটা মোক্ষম ব্যাপার ভুলে বসে আছি। একেই বলে, বাহত্তুরে পাওয়া, দশরথ, অ্যাই দশরথ.....

চীৎকার করে মনোতোষের আব্দারটা বাড়ির সাবেক কাজের লোক দশরথের কাছে চালান করে দেন জগদীশ।

শীতের রোদ ক্রমশ মধুর উত্তাপ ছড়াতে ছড়াতে ঈষৎ চড়া হয়েছে। মনোতোষ তার আমেজটুকু গায়ে মাখতে মাখতে বললেন, এবার যে গরমটা গেল সেটা পারমাণবিক বিস্ফোরণগুলোর জন্য, না রে?

—ওটা আমার জানার বিষয় নয়। শার্লক হোমসের কথা জানিস তো? কোপারনিকাসের তত্ত্বটা পর্যন্ত লোকটা জানত না। কিন্তু, লন্ডনের শহরতলীর মাটি চিনত। আমারও ওসব পরমাণু-টরমানুর দরকার নেই। আমার ব্যাপার অন্য।

—তুই বাবা পিকিউলিয়ার!

মনোতোষ ভ্রূ কুঁচকে তাকান। তারপর বলেন, আমি তোর গেট পেরিয়ে ঢোকার মুখে দেখলাম মাঠের পাশের নতুন রাস্তাটা দিয়ে কয়েক গাড়ি সিমেন্ট, বালি গেল। কার বাড়ি হচ্ছে বলত? আমাদের গ্রুপের তো কারো নয়। — হবে কারো। কত নতুন লোক আসছে। সব বাড়ফাট্টাই। পয়সার গরম। বাগানবাড়ির মালিক হবেন। ও তুই সন্ধেবেলা বেড়াতে বেরোলেই জানতে পেরে যাবি।

মনোতোষ আর কথা বাড়ান না। এই জায়গাটার নির্জনতা নষ্ট হোক এমন কিছু তিনি চান না। কয়েকগজ তফাতে ছড়িয়ে থাকা লম্বা মাঠটার দিকে তাকিয়ে তিনি চায়ের অপেক্ষা করতে থাকেন।

৩

দু'দিকে ছড়ান মরসুমী ফুলের বাগানের ঠিক মাঝখান দিয়ে দশফুট চওড়া নুড়ি বিছোন রাস্তাটা ধরে প্রকাশের গাড়ি এসে থামল বারান্দার কাছে। প্রকাশের স্ত্রী হিমানী, মেয়ে শিবানী আর তার বান্ধবী শ্বেতাকে নিয়ে নেমে এলেন। শ্বেতারা দু'বছর আগেই এখানকার বাড়ি বেচে দিয়ে পাকাপাকিভাবে চলে গেছে। তবুও, শিবানী কখনও দাদুর কাছে বেড়াতে এলে শ্বেতাও তার সঙ্গে চলে আসে।

শ্বেতার সংযত সুন্দর ব্যবহারের জন্য হিমানী আর প্রকাশও তাকে মেয়ের মতই ভালবাসেন। শ্বেতার বাবা নেই। মায়ের কাছেই সে মানুষ। শ্বেতার মা তপস্যার গড়িয়াহাটে একটা বিরাট বুটিক রয়েছে। এখানে সাত-আটজন কর্মচারীর সঙ্গে তাকেও সকাল-সন্ধে মেহনত করতে হয়। শ্বেতাও পড়াশোনার ফাঁকে মাকে যতটা পারে সাহায্য করে। কিন্তু, এক শিবানীদের সঙ্গে ছাড়া বাইরে ঘোরাঘুরিটা তার বড় একটা হয়ে ওঠেনা। তপস্যাও চান, ছুটিছাটার সময়টুকু তার মেয়ে আনন্দ করে বেড়াক। সরকারবাগানের বাড়ি বিক্রির টাকাটা তিনি পুরোপুরি শ্বেতার বিয়ের জন্য তুলে রেখেছেন। দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই তিনি চান একমাত্র মেয়ে শ্বেতা সবসময় লোকজনের মাঝখানে থাকুক। তাই প্রকাশ আর হিমানী এসে যখন শ্বেতাকে তাদের সঙ্গে সরকারবাগানে নিয়ে যাবার অনুরোধ জানালেন তখন বরাবরের মত তিনি এককথায় রাজি হয়ে গেলেন।

দোতলার জানালা দিয়ে প্রকাশের গাড়িটাকে ঢুকতে দেখে জগদীশ দশরথকে সঙ্গে দিয়ে নিচে নেমে এলেন। প্রকাশ আর হিমানী তাকে প্রণাম

করল

জগদীশ বললেন, থাক থাক। তোরা হাত মুখ ধুয়ে আগে ফ্রেশ হয়ে নে, তারপর জমিয়ে বসব।

হিমানী বলল, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, বাবা। আমি বরং দশরথের সঙ্গে রান্নার জোগাড় দেখি।

জগদীশ একগাল হেসে বললেন, কিছু করতে হবে না। স্টেশনের কাছে চমৎকার একটা হোটেল হয়েছে। আমি ওখান থেকে মাটন বিরিয়ানী, চিকেন রেশমী কাবাব, চিলি ফিস—তোদের সব প্রিয় ডিশ আধঘণ্টা আগেই আনিয়ে রেখেছি।

হিমানী চোখ বড় বড় করে শ্বশুরের দিকে তাকালেন। সম্পর্কে শ্বশুর হলেও নিজের বাবার থেকেও তিনি তাকে বেশি ভালবাসেন। তার শিশুসুলভ খবরদারীর ধাক্কায় জগদীশ এখনও অসহায় বোধ করেন। সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা আনন্দও হয় তার। এ অঞ্চলের সবচেয়ে ডাকসাইটে রূপসী হিমানীকে তিনি বাইশ বছর আগে একটা পেয়ারা গাছের মাথায় আবিষ্কার করেন। তখন হিমানী মেরেকেটে সতের। গোটা দুই পেয়ারা তার কাছ থেকে ম্যানেজ করে লুকিয়ে তার পেছন পেছন গিয়ে ওদের বাড়িটাও আবিষ্কার করে আসেন। পরের বছর প্রকাশের সাথে তার বিয়েটা দেবার মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত তার ধারণায়, এটাই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ।

জগদীশের চোখের সামনে দিয়ে চলমান ছবির মত অনেকগুলো বছর ভেসে গেল। চোখ দুটো একটু ঝাপসাও হয়ে এল।

হিমানী জগদীশকে এত ভাল চেনেন যে ততটা বোধহয় তার নিজের ছেলেও চেনেন না। তিনি হঠাৎ বললেন, বিরিয়ানী তো এনেছ। সেটা গরম রাখতে হয় কি করে জান?

ব্যস্! এক ধাক্কায় জগদীশ বাস্তবে নেমে এলেন। বললেন, সর্বনাশ! এটা তো ভাবিনি। আচ্ছা, মাইক্রোওভেনে ঢুকিয়ে দিলে হয়না?

—তোমার মুন্ডু! গরম জলের হাঁড়ির ওপর একটা থালা রেখে—যাক্‌গে, ওসব তুমি বুঝবে না। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

আশঙ্কাসঙ্কুল মুখে জগদীশ ভেতরের দিকে এগোলেন, অথবা, বলা যায় হিমানী তার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে এগিয়ে চললেন। বাবার মুখের অসহায় ভাব দেখে হো হো করে হেসে ফেললেন প্রকাশ। দশরথ ততক্ষণে গাড়ির ভেতর থেকে মালপত্তর বার করে দোতলার শোবার ঘরগুলোয় চালান করতে শুরু করেছে। সে'ও মিটমিট করে হাসছে তার বুড়োবাবার কাণ্ডকারখানা দেখে। নিজেকে সে এই পরিবারেরই একজন সদস্য মনে করে। এদের সুখ দুঃখকে আপন করে নেয়।

শিবানী আর শ্বেতা গাড়ি থেকে নেমেই ফুলের বাগানে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। গোটাকতক ফুল তুলতে না তুলতেই মা, বাবা, দাদু তাদের ফেলে রেখেই ভেতরে ঢুকে গেল দেখে দুজনেই এক দৌড়ে বারান্দায় কাছে এসে কয়েক লাফে সিঁড়ির ওপরে উঠে এল।

লিভিংরুমে এসে টিভিটা অন্ করে সোফার ওপর ক্লান্ত শরীরগুলো ছুঁড়ে দিল শিবানী আর শ্বেতা।

শ্বেতা শিবানীর দিকে একবার করুণভাবে তাকাল।

শিবানী বলল, কি হল রে?

শ্বেতা বলল, ব্রা আর প্যান্টিটা এত টাইট লাগছে যে মনে হচ্ছে এবার কেটে বসবে।

শিবানী বলল, এমা! আগে বলবি তো! তিন তিনটে ঘণ্টা জার্নি করেছিস, এ'রম তো হবেই।

শ্বেতা বলল, তুই যে কি করে জীন্‌স আর জ্যাকেট এঁটে এতক্ষণ বসে আছিস!—

শিবানী বলল, আরে, আমি তো ভেতরে কিচ্ছু পরিনি। দ্যাখ্‌না জীন্‌সটা একটু ঢলো আর গেঞ্জীটা একটু পাতলা বলে ওপরে এই লম্বা জ্যাকেট চাপিয়ে নিয়েছি।

শ্বেতা বলল, এমা! ঐরম আমি জীবনেও পারব না।

শিবানী তার থুত্‌নিটা দু'আঙুলের ফাঁকে ধরে বলল, সব পারবি। একদম নিপোষাক হয়ে ঘুরবি। সময় হোক।

শ্বেতা বলল, যাঃ! সে সময় কোনদিনও আসবে না।

শিবানী বলল, সেটার জন্য না হয় আমিই চেষ্টা করব। এখন ওঠ। ওপরে গিয়ে মুখেটুখে একটু সাবান দিয়ে একটা ম্যাক্সি পরে নে। খেয়েদেয়ে দুটো চেয়ার নিয়ে ছাদের সিমেণ্টের ছাতার নিচে বসব।

শ্বেতা সোফা ছেড়ে উঠে বলল, ছাদ থেকে সেই বেড়াল-বাড়িটা দেখা যায় না?

শিবানীর মুখখানা কেমন একরকম হয়ে গেল। সে বলল, বেড়াল-বাড়িই বটে!

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময় শ্বেতা একমুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে শিবানীকে বলল, নার্সিংহোমে যখন বাবার প্রচণ্ড ব্লিডিং হচ্ছে, তখন অত কষ্টের ভেতর বাবা ঠিক একটা শব্দই উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন।

শিবানী ধরা গলায় বলল, কি সেটা?

—বেড়াল। শব্দটা শ্বেতার গলা থেকে যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল

শিবানী হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বন্ধুর দিকে।

৪

সারাদিন নাতনী আর বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তিতে কাটিয়ে সন্ধের একটু আগে গরম চাদর গায়ে জগদীশ বাড়ি ছেড়ে অভ্যাসমত বেরিয়ে পড়লেন। মনোতোষকে ডাকার আগে তার হঠাৎ একবার মাঠের পাশের বাড়িটার কাছ থেকে ঘুরে আসার ইচ্ছে হল। ইচ্ছেটা এমনই প্রবল, যে তাড়াতাড়ি মাঠটা পেরোবার সময় তার মনে হল, কে যেন বাড়িটার দিকে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই পা দুটো যেন মাটির সাথে আটকে গেল জগদীশের। বাড়িটার সামনের ঘাসজমি পরিষ্কার করে ডাঁই করে ইটের গাদা জমিয়ে রাখা হয়েছে। বারান্দার ওপরে চোখে পড়ছে সিমেন্টের বস্তার পাহাড়। বাগানের একদম কোণে একটা জামরুল গাছের নীচে পাজামা-পাঞ্জাবী পরা ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের এক যুবক দাঁড়িয়ে। তার কোলে একটা বেড়ালছানা।

পেছন থেকে ছেলেটার মুখ দেখতে পেলেন না জগদীশ। কিন্তু তার শরীরের গঠন থেকে অনুভব করলেন, ছেলেটি শক্তি ধরে। এখানে ঠান্ডা পড়েছে কলকাতার দ্বিগুণ। কিন্তু, এ'রম শীতের হিমেল হাওয়ার ভেতরেও কেবল একটা পাঞ্জাবী সম্বল করে কি করে ও দাঁড়িয়ে আছে! এটা যৌবনের উত্তাপ হতে পারে ধরে নিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেন জগদীশ। এগিয়ে ছেলেটার ঠিক পেছনে ভাঙা পাঁচিলটার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই ছেলেটার। একদৃষ্টে পুরানো বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পেছনে যে একজন মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে সে

সম্বন্ধে কোন আগ্রহই যেন ছেলেটার নেই। বাতাসে কান পাতলেন জগদীশবাবু। একটা অদ্ভুত সুন্দর সুর যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন। মৃদু ঘুমপাড়ানি সুর। কেমন অবশ মনে হল নিজেকে জগদীশবাবুর। ছেলেটার মুখ থেকে অপার্থিব একটা সুরেলা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। ঢিমে তালে ওঠানামা করছে সুরটা, আর মাঝে মাঝে তার সাথে যোগ হচ্ছে মৃদু 'মিউ মিউ' ডাক। কোলের বেড়ালটা বোধহয় মালিকের সঙ্গে সঙ্গত করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্ট হয়ে পড়লেন জগদীশবাবু। সুরটা তাকে আনন্দ দিচ্ছে। অদ্ভুত অনৈসর্গিক আনন্দ। ছেলেটার কয়েক ফুট তফাতে দাঁড়িয়ে প্রায় দুলতে আরম্ভ করলেন জগদীশবাবু।

আবছা অন্ধকারের ভেতর এক রামধাক্কায় সম্বিৎ ফিরে পেলেন জগদীশবাবু। ধাক্কাটা দিয়ে তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মনোতোষ। জগদীশবাবু চোখ দুটো কচলে নিয়ে চারদিকে তাকালেন। ছেলেটার বা তার সঙ্গের বেড়ালটার কোন চিহ্ন নেই।

মনোতোষ বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছিলি বলে মনে হল। তোর যে মাঝে মাঝে কি হয়! রাস্তা ছেড়ে এই হিমের ভেতর মাঠে নামতে গেলি কেন?

নিজের অবস্থার কথা এবার বিবেচনায় আনলেন জগদীশ। এই সামান্য সময়টকুর ভেতর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা এই মুহূর্তে মনোতোষকে না বলাই ভাল। বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে মাঠটা পেরিয়ে যাওয়ার মুখে তিনি বললেন, তোর বেড়াল-বাড়ি আবার নতুন হয়ে উঠবে রে!

৫

বাথটবের ভেতর গরম জলে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট ফেনার পাহাড় তৈরী করছিল শিবানী। রাত যত বাড়ছে ঠান্ডাটা ততই কনকনে হচ্ছে। কিন্তু রাতেও একবার স্নান না করলে আজকাল আর হয়না

শিবানীর। সে যেন শরীরের ভেতর আস্ত একটা আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে রেখেছে। মা বলেন, এটা বয়সের লক্ষণ। তাছাড়া তাদের পরিবারে স্বাস্থ্য-টাস্থ্য সকলেরই একটু বেশি মাত্রাতেই ভাল। তার নিজেরও গত কুড়ি বছরে মোট কুড়িবারও জ্বরজারি হয়েছে কিনা সন্দেহ। কথাটা মাথায় আসতেই নিজেকে বীরাঙ্গনা বলে মনে হল শিবানীর।

পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির শরীরটা তার হিলহিলে সাপের মত। মায়ে মত অত বেশি রূপসী না হলেও তার চেহারা অসম্ভব সুন্দর। গীজার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ নিজের কথা ভাবল শিবানী। কলেজের তি বছরে সে মোট দুশো একুশটা প্রেমপত্র পেয়েছে। এটা তাদের বান্ধবী ভেতর একটা রেকর্ড। একমাত্র শ্বেতা তার সাথে পাল্লা দিতে পারে আর কেউ নয়, এ বিশ্বাস তার আছে।

বিশাল স্পঞ্জটা আদুরে কায়দায় গলায় বুকে ডলে দু'পায়ের সন্ধিতে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে এতদিন ধরে পাওয়া চিঠিগুলোর কথা মনে হল শিবানীর। একজনও সম্ভবত বাংলা জানেনা। ভুল ভাব, ভুল ভাষা আর মাঝে মাঝে বিষাক্ত হিন্দির খিচুড়ি— এমন ভয়াবহ ব্যাকরণ সে জীবনেও দেখেনি। প্রতিটা চিঠিই সে তার মাকে পড়িয়েছে। হেসে কুটিপাটি হয়েছে দুজনে মিলে। একটু অন্যভাবে হয়ত বিনোদনেরই বিষয় হয়েছে সেগুলো। প্রকাশও পড়েছেন দু'একটা চিঠি। হিমানী বলেছেন, তোমাকে অতি সামান্য যে কয়েকটা লিখেছি বলে মনে হচ্ছে সেগুলো বোধহয় এর চেয়ে বেটার। শিবানী বাবার পিঠে দুটো আদুরে ঘুঁসি বসিয়ে দেবার সময় দেখেছে, হিমানীর মুখে অদ্ভুত এক আভাস। এত বছর বিয়ে হয়েছে ওদের তা সত্ত্বেও — আশ্চর্য।

সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে টাব থেকে নেমে দেয়ালের গায়ের হুক থেকে নিজের টাওয়েলটা নামিয়ে কাঁধের ওপর আলতো করে ফেলে সেভাবেই লিভিংরুমে এসে ঢুকল শিবানী। এ বাড়ির পাঁচটা অংশের প্রতিটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। হোটেলের মত করিডোরে না বেরোলে একে

অপরের ঘরে ঢোকার উপায় নেই। প্রায় হাজার স্কোয়ার ফীটের বন্ধ লিভিং রুমটার স্বাধীনতার স্বাদ নিতেই যেন কার্পেটের ওপর ব্যালেরিনাদের মত নাচতে আরম্ভ করল শিবানী। টাওয়েলটা ষাঁড়ের সঙ্গে মাতাদোরদের লড়াই-ভঙ্গীতে সামনে পেছনে নিয়ে সমস্ত ঘরটা দাপিয়ে বেড়াতে আরম্ভ করল সে।

কিছুক্ষণ পর একটু ক্লান্ত বোধ করল শিবানী। গায়ের ওপর থেকে [illegible]য়েলটা কাউচের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সবচেয়ে পাতলা এবং স্লিভলেশ [illegible]টিটা ওয়ারড্রোব থেকে বের করে গায়ে চড়িয়ে স্যামসাং-এর বিশাল [illegible]নকোরা টিভির ওপর থেকে রিমোট কন্ট্রোলারটা তুলতে যেতে অজান্তেই ওর চোখ দুটো চলে গেল কাচের জানলার বাইরে। মাঠের ধারের রহস্যময় সেই বাড়িটার একতলার ফাঁকা অংশের ছাদটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত একটা ব্যাপার চলছে সেখানে। শিবানী যন্ত্রচালিতের মত শ্বেতাকে ডেকে নিয়ে আসে।

কাছে এসে শিবানীর দু'কাঁধে হাত রেখে বাড়িটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় শ্বেতা। জানলাটা শিবানী খুলে দেওয়ায় সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নির্বাক বিস্ময় নিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে তাকে দুজন।

ছাদের ঠিক মাঝখানে একটা লণ্ঠন রাখা। ফুটবল আকারের লণ্ঠনটার সবদিক থেকে ফ্যাক্‌ফেকে সাদা আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যতদূর পর্যন্ত আলোটা অন্ধকার খুঁড়ে এগিয়ে গেছে ততদূর অব্দি দেখা যাচ্ছে বেড়ালদের এক একটা গোলাকার সারি। ছোট একটা বৃত্ত থেকে ক্রমশ বড় হতে হতে সেটা গোটা ছাদটাকে দখল করে নিয়েছে। বেড়ালগুলোর একটার ভেতরেও প্রাণের স্পন্দন নেই। কোন একটা অদৃশ্য সঙ্কেতের অপেক্ষায় যেন রয়েছে সকলে।

বেড়ালদের তৈরী করা বৃত্তগুলো যে কেন্দ্রে এসে মিশে গেছে সেখানে তেপায়ার ওপর লণ্ঠনটার পাশে একটা ইজিচেয়ারে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে একজন পুরুষ বসে রয়েছে। আলোর অবস্থানের হিসেবে পুরুষটি যেখানে

বসে আছে সেই আবছায়ামাখা জায়গাটা খুব স্পষ্ট দেখা না গেলেও শিবানীরা বুঝল বেড়ালদের দলের সাথে তার একটা অদ্ভুত সাঙ্কেতিক ভাব বিনিময় চলছে। পুরুষটির দু'হাত একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠছে আর নামছে। সেই সঙ্গে লণ্ঠনের আলোর প্রাবল্য যেন কমে আসছে। উত্তেজনায় শ্বেতা আরো জোরে খামচে ধরল শিবানীর কাঁধ দুটো।

পুরুষটির হাতদুটোর আন্দোলন দ্রুততর হয়ে ওঠার মুহূর্তে বেড়ালগুলোর শরীরে সাঁতারুদের একটা লক্ষণ দেখা গেল। শেষবারের মত ওঠনামা করল হাত দুটো। সেই সঙ্গে গোটা ছাদের সমস্ত বেড়াল একসঙ্গে গা ঝাড়া দিয়ে লাফিয়ে উঠল। ভীষণ চমকে উঠল দুই বান্ধবী। লণ্ঠনটা যেন একটা ফুঁয়ে কেউ নিভিয়ে দিয়েছে। চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভেতর দুটো ছোট্ট আলোর বিন্দু জেগে উঠল। ঠিক যেন নিশাচর প্রাণী একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

শিবানী, শ্বেতা কেউই আর সহ্য করতে পারল না। একটা আতঙ্ক যেন আপাদমস্তক গিলে খেতে আসছে তাদের। জানলাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল ওরা। টিভিটা অন্ করে ভল্যুমটা বেশ জোরাল করে দিয়ে কাউচের ওপর এসে বসতে যেন একটু স্বাভাবিক হল দুজন।

শ্বেতা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল। ভাগ্যিস সময়মত আমায় ডেকে এনেছিলি! কে বলত লোকটা? করছেটাই বা কি? বেড়ালগুলো কি ওর পোষা?

শিবানী শান্তভাবে বলল, সে সকালবেলা দাদুকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। দাদু আজ সন্ধেবেলা বাড়িটার কাছে গিয়েছিল, আজ দেখেছি।

শ্বেতা বলল, লোকটা কি অসভ্যের মত বসেছে! কিছু পরেনি! এই শীতের মধ্যে! পাগল টাগল না তো?

শিবানী বলল, পৃথিবীর কোন পাগলের সাথে অতগুলো বাধ্য বেড়াল থাকেনা।

শ্বেতা বলল, ঐ আলোটা! বেড়ালগুলোর ও'রম মড়ার মত বসে থাকা, তারপর ওভাবে লাফিয়ে ওঠা—

শিবানী তাকে বাধা দিয়ে বলল, আর এসব নয়। একদিনে অনেক হয়ে গেছে। খাওয়ার পর না হয় আমার সাথে শু'স। তখন এসবের মানে কি ভেবেচিন্তে বার করে নেওয়া যাবে।

খাওয়ার পরে শিবানীর ঘরে বিছানায় এসে শুয়ে খানিক আগের ব্যাপার নিয়ে দু'বন্ধুতে কথা হল। ঠিক করা হল, কাল পুরোনো বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় বাড়িটা একবার ভাল করে দেখে আসা হবে। শিবানীর চোখদুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। শ্বেতা একবার হাই তুলে শেষবারের মত বলল, দুটো আলোর মত কি দেখলাম না? ঠিক মনে হল, একজোড়া চোখ আমাদের দেখছে।

—আমাকে না, শুধু তোকে। আর ও গল্প ছ'বছর আগে অনুও শুনিয়েছিল।

শ্বেতা ঘুমিয়ে পড়ল।

৬

বেলা আটটার সময়েই আকাশে থিকথিকে কালো মেঘ জমতে দেখে অবাক হয়ে হিমানী প্রকাশকে এসে বললেন, কি অদ্ভুত ব্যাপার দ্যাখো! বৃষ্টি টিষ্টি হবে নাকি?

ড্রেসিং গাউন পরা অবস্থাতেই বিছানার ওপর বজ্রাসনে বসেছিলেন প্রকাশ। হিমানীর কথা শুনে খুব ভাল করে তার মুখখানা খুঁটিয়ে দেখলেন। প্রকাশের চোখ দুটোকে হিমানী খুব ভয় পান। বড় বড় চোখদুটোর গভীর চাহনীর সামনে তার নিজেকে বড় অসহায় লাগে।

প্রকাশ বললেন, বৃষ্টি তো তুমি ভালবাসো। হোক না ক্ষতি কি!

—বাবার ঠান্ডা লেগে যাবে না! তোমারও তো সাইনাসের ব্যাপার আছে।

হিমানী একটু অস্বস্তির সঙ্গে তার গোলাপি ম্যাক্সির ওপর চাপান কার্ডিগানটা টেনেটুনে ঠিক করে প্রকাশের পাশেই ধপ্ বসে পড়লেন।

—আমি নিয়মিত কপালভাতি করি। বাবার কাছেই শেখা। টুক্‌টাক্ তুমি যা দেখ — এই মানে ছোটখাটো শরীর খারাপের ব্যাপার—সেগুলো কিছুই না। প্রকাশ হাল্কা হেসে বললেন।

হিমানী খোলা জানলার দিকে তাকালেন। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রকাশ সকালবেলার খোলামেলা হাওয়া পছন্দ করেন, তা না হলে হিমানী এমন দিনে কিছুতেই তাকে জানলা খুলতে দিতেন না।

জগদীশের বাড়ির একটা বৈশিষ্ট্য তার আয়তন। গোটা বাড়িটার ওপর নীচ মিলিয়ে মোট বারোটা ঘরের চার-পাঁচটা এত বড় যে গোটা কয়েক আস্ত বাড়িই তার ভেতর ঢুকে যেতে পারে। এই ব্যাপারটা তার মত সমস্ত মেয়েকে উল্লসিত করলেও হিমানীকে বিব্রত করে। তার বান্ধবীরা যখন তারই করায়ত্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিশদ তবিল খুলে তুলনামূলকভাবে নিজেদের তথাকথিত অসহায় অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাখ্যা করতে বসে তখন ভারি অস্বস্তি হয় হিমানীর। অর্থের মাপকাঠিতে সামাজিক অবস্থানের নির্ধারণে তিনি বিশ্বাস করেন না। তার মনে হয়, সাধারণ কোন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মত এক চিলতে কামরার কোন পরিসরে তারা যদি থাকতে পারতেন অহলে হয়ত কোন ঈর্ষার দৃষ্টি তাকে স্পর্শ করতে পারত না।

— আমাকে একটা চুমু খাবে? প্রকাশের আচমকা আবদারে চিন্তা শতখণ্ড হয়ে হিমানীর মুখখানায় সূর্যাস্তের রঙ ধরল।

— তুমি আজকাল ভীষণ অসময়ে অসম্ভব কিছু চেয়ে বস। অনুপম একটা ভঙ্গীতে শরীর মুচড়ে খাট থেকে নেমে যেতে চাইলেন হিমানী।

প্রকাশ প্রায় লাফ দিয়ে তাকে বুকের মাঝখানে টেনে নিয়ে চুমু খেতে আরম্ভ করলেন। হিমানী হাত, পা ছুঁড়তে শুরু করলেন। একসময় দুজনের শরীরের ওপর দারুণ নক্‌শাদার কভারে মোড়া লেপখানা টেনে নিলেন প্রকাশ।

বাইরে তখন ভরা শ্রাবণের মতই আকাশ ফুটো করা বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

দশটার সময় বৃষ্টির তেজ যখন আরো প্রবল হয়েছে সদর দরজার বেলটা তখন এমনভাবে বেজে উঠল যে চোখ খুলে প্রথমেই ঘড়ির দিকে তাকালেন জগদীশ। আবারও বাজল বেলটা। বৃষ্টির ছাটের শব্দের সাথে বেলের আওয়াজ মিশে যাচ্ছে। আরেকবার বেলটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই কেউ দরজা খুলে দিল। জগদীশ তাড়াতড়ি বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে এগোলেন।

একতলার লিভিংরুমে তখন ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। হিমানী আর প্রকাশ অন্ধকার মুখে বসে আছেন। পাড়ার কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে মনোতোষও এসেছেন। শ্বেতা আর শিবানী বার কয়েক উঁকিঝুঁকি দিতে হিমানী উঠে গিয়ে ওদের আপাতত এঘরে আসতে মানা করে দিয়েছেন। বাইরের ঝম্‌ঝমে বৃষ্টির ছোঁয়া ঘরের ভেতরেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মার্বেলের মেঝের ওপর যতটুকু অংশে কার্পেট পাতা তার ওপর জলের ছাপে ছোট ছোট মানচিত্র তৈরী হয়েছে। অতিথিদের বেশিরভাগই আপাদমস্তক ভেজা।

জগদীশ পোষাক বদলে যখন ঘরে এসে ঢুকলেন অমনি মনোতোষের দৃষ্টি প্রায় যন্ত্রের মতই হিমানীর দিকে ঘুরে গেল।

হিমানী পরিস্থিতিটা বুঝলেন। ঘরে ঢোকার সময়েই মনোতোষকাকা বলেছেন তারা একটা সাংঘাতিক খারাপ খবর এনেছেন। কিন্তু, খবরটা হয়ত তার সামনে দেওয়ার কোন অসুবিধে আছে, সেজন্য মনোতোষকাকা তাকে সামনে থেকে সরাতে চান।

সামান্য হেসে হিমানী তাকে বললেন, আপনারা বসুন কাকা। আমি আপনাদের কফি করে আনি।

হিমানী বেরিয়ে যেতে প্রকাশও একটু ইতস্তত করছিলেন। উপস্থিত প্রায় সকলেই তার বাবার বয়সী এবং এ অঞ্চলের যাবতীয় ব্যাপারে শেষ কথা এঁরাই বলে থাকেন। সেখানে—

জগদীশ মনোতোষের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে প্রকাশকে দেখে নিয়ে বললেন, উঠিস না। তোকেও দরকার হতে পারে।

প্রকাশ আর ওঠার চেষ্টা করেন না।

সোফায় বসে জগদীশ সকলের দিকে আরেকবার তাকিয়ে মনোতোষকে জিজ্ঞেস করেন, কি ব্যাপার রে? কি হয়েছে?

মনোতোষ বললেন, কি করে যে বলি! অদ্ভুত ব্যাপার! সাহাদের গ্যারেজটা রাত প্রায় দেড়টা দুটো অব্দি খোলা থাকে। সেটা তো জানিস। ড্রাইভার বুধুয়া ওর বৌ লছমী আর মেয়ে রামাইয়াকে নিয়ে শুতে শুতে অনেক রাত করে ফেলে। তো, কালও ওরা তাই-ই করেছিল বোধহয়—

— খুন হয়ে গেছে ওদের তিনজন, বুঝলেন? একধার থেকে খুন হয়ে গেছে সবাই।

মনোতোষের কথা শেষ না হতেই সোফায় বসা তারই বয়সী একজন প্রসঙ্গটা সরাসরি শেষ করে দিলেন।

লোকটার কথা বলার ভঙ্গী পছন্দ না হলেও তার দিকে তাকাতে বাধ্য হলেন জগদীশ। মনের ভাব গোপন রেখে তাকেই জিজ্ঞেস করলেন, একটা নিরীহ দেহাতি মানুষ আর তার নিরীহতম বউ আর মেয়েকে মেরে কার কি লাভ হল?

জগদীশের সাধারণ মানবিক প্রশ্নটার জবাব এল মনোতোষের কাছ থেকে। উত্তরটা দিতে তার মুখখানা বিকৃত হয়ে গেল যেন। বললেন, ব্রুটাল মার্ডরস। যেই করে থাকুক ঘুমন্ত অবস্থায় থাকাকালীন অ্যাটাক করেছে। তিনজনেরই গলার নলি ছিন্নভিন্ন। সমস্ত শরীরে বীভৎস সব ক্ষত। মনে হয়, মাংসগুলো কেউ খুবলে তুলে নিয়েছে। লাশগুলো চালান করার সময় সারা ঘরে থই থই করা রক্ত দেখে আমার বমি পেয়ে গিয়েছিল!

—ওঃ! লাশ তবে চালান হয়ে গেছে!

মনোতোষ একটু অপ্রতিভ হলেন। বললেন, সাহাবাবুই হাঁকডাক করে সাত তাড়াতাড়ি পুলিশ নিয়ে এলেন! তোকে খবর দিতে তাই এতটা দেরী হয়ে গেল।

সমবেত ভদ্রলোকদের ভেতর যিনি খুনের কথাটা আগ বাড়িয়ে বলে ফেলেছিলেন তিনি আরেকবার বলে ফেললেন, অনন্তর দোষ নেই। সাত সকালে নিজেরই বাড়ির একতলার গ্যারাজে কেউ যদি তিন তিনটে লাশ পড়ে থাকতে দেখে তাহলে তার মাথা এমনিতেই ঠিক থাকে না।

জগদীশ সোফার ওপর ভ্রূ কুঞ্চিত করে বসে থেকে খানিকক্ষণ কিছু একটা ভেবে বললেন, বৃষ্টি শুরু হবার আগেই তাহলে অনন্ত মর্নিংওয়াক করার জন্য বেরোচ্ছিল—

—রাইট। কংক্রিটের বড় উঠোনটা পেরোবার সময় ও দেখে, গ্যারাজের আধখোল শাটারের নীচ থেকে রক্তের স্রোত বেরিয়ে আসছে।

শাটার তুলে ভেতরকার অবস্থা দেখে ও আর কালবিলম্ব না করে ফোন করে আমাদের সকলকে ডেকে নেয়। আমরা আসার আধঘণ্টার ভেতরেই পুলিশ আসে।

—মার্ডারগুলো করা হল কি দিয়ে? মানে, কোন অস্ত্র-টস্ত্র পাওয়া গেছে কি?

—কিচ্ছু না। কোন মোটিভও নেই। এই ড্রাইভারের পরিবারও বিহার থেকে এসেছে সবে গতপরশু। তাছাড়া বুধুয়াও তো মাসখানেক হল কাজে লেগেছে। শুনলাম, এখনও মাইনেই পায়নি। সবটাই রহস্য।

—পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করল না?

—রথীন এসেছিল। তোরই তো ছাত্র ছিল একসময়। কিছু প্রশ্ন করল সকলকে। কিন্তু বুধুয়াদের প্রায় কেউই চেনেনা। অনন্তদের তো এইটুকু একটা কাজের মেয়ে ছাড়া বাইরের কেউই নেই। সে আবার অনন্তর বৌ আর মেয়ের মতই তারস্বরে কান্নাকাটি করে বাড়ি মাথায় করছে দেখে আর অকুস্থল থেকে গত কয়েকঘণ্টার ভেতর ছোট, বড় মাঝারি কোনরকম আর্তচীৎকার তো দূরের কথা সামান্য সন্দেহজনক কোন শব্দও শোনা যায়নি জেনে রথীন বোধহয় একটু অস্বস্তি নিয়েই চলে গেল। যাওয়ার আগে আমাকে দেখে গম্ভীরভাবে বলল, কাকা, আমার কিন্তু ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না। কোন মানুষ এভাবে খুন করতে পারেনা।

আপনি মাস্টারমশাইকে একটু খবর দেবেন তো। পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা নিয়ে আমি একবার ওঁর সাথে দেখা করব।

রথীন জগদীশবাবুর জীবনের প্রথম ব্যাচের স্টুডেন্ট। প্রকাশের ক্লাসমেট।

জগদীশ তখন নামী কলেজে বাংলা পড়ান। প্রকাশের মা'র কয়েকদিনের জ্বরে আচমকা মৃত্যু ঘটায় জীবনের ওপর সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিলেন জগদীশ। সারাদিন কলেজ করে এসে বিরাট পার্সোনাল লাইব্রেরীরুমে বসে পড়াশোনা করে প্রায় গোটা রাতটুকু কাটিয়ে দিতেন তিনি। ক্রমশ ইনসমনিয়ার রুগী হয়ে পড়েছিলেন। এ'রমই একটা সময় একদিন প্রকাশ রথীনকে সঙ্গে করে তার কাছে নিয়ে আসেন। রথীনের বাবা-মা কেউই ছিলেন না। অনাথ রথীনকে মামার বাড়িতে অনেকটা বিনি মাইনের চাকরের মত থাকতে হত। লেখাপড়ার অদম্য ইচ্ছেটুকুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে বয়সেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হত তাকে। প্রকাশ বন্ধুকে এত ভালবাসতেন, যে তার এসব সহ্য হত না। তাছাড়া, সদ্য মাতৃহারা প্রকাশ রথীনের দুঃখের কোন কোন জায়গার সঙ্গে নিজের জীবনের শূন্যতার সাদৃশ্য দেখতে পেতেন।

অনেকটা প্রকাশেরই চাপাচাপিতে রথীন এবং তারই মত অবস্থার গোটা চার-পাঁচেক ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটা কোচিং ক্লাস চালু করে দেন জগদীশ। নিজের বিষয় ছাড়াও আরো গোটা পাঁচেক বিষয় তিনি একাই সামলে নিতে পারতেন। অগাধ পান্ডিত্যের সঙ্গে তার নিজস্ব বইয়ের ভান্ডার যোগ হওয়ার কয়েক মাসের ভেতরই অভাবনীয় ফলাফল দেখা গেল। জেলার স্কুলে তাক্ লাগান রেজাল্ট করে এল প্রত্যেকে। জগদীশ জীবনের ওপর হারানো উৎসাহ ফিরে পেলেন। অভিভাবকদের চেয়েও ঢের বেশি যত্ন নিয়ে দিনের পর দিনের চেষ্টায় সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় নিজের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে তিনি এমন স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে একটা সময় তার খ্যাতির কথা গোটা জেলায় ছড়িয়ে যায়। রথীন তার সেই কৃতী ছাত্রদের একজন ভাবলেও ভাল লাগে জগদীশের। হাটেবাজারে কখনও তাকে দেখতে পেলে রথীনের জীপ থেমে যায়। যে ভঙ্গীতে রথীন তাকে প্রণাম করেন তা দেখলে অনেকেরই মনে হবে তিনি বোধহয় স্বচক্ষে দেবদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন।

অনেকবার বহু ছাত্রছাত্রীকে জগদীশ ব্যর্থভাবে বলে এসেছেন, ওরে, এত প্রণাম করিস না। পার্মানেন্টলি কুঁজো হয়ে যাবি। কিন্তু রথীনের মতই

কেউই তার কথা শোনেনা এবং রথীনের পাশাপাশি তারাও সমাজের বিভিন্ন স্তরে কেষ্টবিষ্টু হয়ে দাঁড়িয়েছে। রথীনের মত এদের জন্যই জগদীশের প্রাপ্তির ঘর উপচে জীবনের বহু শূন্যস্থান ভরাট হয়ে গেছে।

রথীনের ভাবনায় হারিয়ে যাচ্ছিলেন জগদীশ। এমন সময় হিমানী এসে ঘরে ঢুকলেন। তার হাতের ট্রেতে একটা পেল্লায় কফির জাগ সেই সঙ্গে গোটাকতক বড় মাপের পেয়ালা।

সেণ্টার টেবিলের ওপর ট্রেটা নামিয়ে রাখতেই মনোতোষ বললেন, তুমি আবার কষ্ট করতে গেলে কেন মা?

জগদীশ বললেন, ঠিকই তো। দশরথ—

হিমানী মনোতোষ আর জগদীশের দিকে গম্ভীরভাবে তাকালেন। দু'বন্ধুর কেউই আর কথা বলার সাহস পেলেন না।

হিমানী ফিক্ করে হেসে ফেললেন। বললেন, দশরথ জলখাবার নিয়ে আসছে।

বলতে বলতেই দশরথ পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতর আসে। তার হাতে ঢাউস ট্রেতে কিছু প্লেটে সাজান ধূমায়িত লুচি, আলুফুলকপির তরকারি।

হিমানী ঘর ছাড়ার আগে মনোতোষকে বললেন, বাবাকে দূরে কোথাও নিয়ে গেলে—

—দূরে না. মা। মনোতোষ তাড়াতাড়ি বলেন, এই কাছেই। একটু বাদে চলে আসবে।

হিমানী সম্মতি জানিয়ে ভেতরে চলে যান। তারপর দশরথকে ডেকে ডাকব্যাকের একটা নতুন বর্ষাতি আর একজোড়া গামবুট গুছিয়ে দিয়ে

বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেন।

ঘরের ভেতর তখন মনোতোষ খাওয়া শেষ করে রুমালে হাত মুছে জগদীশকে বললেন, দুপুরের আগে আবার রথীন হোমিসাইড ডিপার্টমেণ্টের কাকে কাকে নিয়ে যেন আসবে। তুই থাকলে ভাল হয়। আরেকবার হয়ত তোকে আসতে হবে, এই যা। অবশ্য, রথীন পারসোনালি তোর সাথে বসছেই। কিন্তু অনন্তের বাড়ির ব্যাপার—আমাদের এত 'দাদা', 'দাদা' করে। ভাবলাম, তুই যদি একটু আগেই গিয়ে একটু দেখে টেখে —

—দেখার পক্ষে একটু দেরিই হয়ে গেছে। উন্ডস্‌গুলো নিজের চোখে দেখলে ভাল হত। তবে, আবার একবার যখন যেতে বলছিস তখন বেশি সময় নেবনা। চল্‌—

—জগদীশ উঠে পড়লেন। দেখাদেখি প্রকাশসহ সকলেই উঠে পড়লেন।

—মনোতোষ বললেন, রথীন চিরুনী তল্লাশী আরম্ভ করেছে। অপরাধী পার পাবেনা।

—বারান্দায় এসে দশরথের হাত থেকে বর্ষাতিটা নিয়ে গামবুটটা পায়ে গলিয়ে বৃষ্টির ভেতর থেকে নেমে আসার সময় জগদীশের দৃষ্টি পড়ল মরসুমি ফুলগুলোর ওপর। বুধুয়াদের মতই সেগুলো অকালে ঝরে গেছে।

৭

সারাটা সকাল লিভিং রুম থেকে সিঁড়ির ঘরে বেরোবার একটা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু শুনে নিয়েছিল শিবানী আর শ্বেতা। কেমন যেন ভয় ভয় করছিল ওদের। এর আগে কখনও এমন হয়নি। এ বাড়িতে পা রাখার পর থেকেই যেন পরপর অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে।

দু'তিন ঘণ্টার ভেতরেও যখন বৃষ্টি ধরে আসার কোন লক্ষণ দেখা গেলনা তখন দুজনেই অস্থির হয়ে উঠল। শিবানী একফাঁকে গিয়ে মাকে বলে এল, বৃষ্টি থামুক আর না থামুক সে একবার অন্তত শ্বেতাকে নিয়ে অনুর বাড়ি যাবেই। হিমানী রাজী হয়ে গেছেন। এরপর প্রকাশ কোথাও যেতে চাইলে তাতেও তিনি বাধা দেবেন না। কারণ, আজ একটু একান্তে তিনি রান্নাবান্না করতে চান। বছরের বেশির ভাগ সময় কলকাতায় থাকার কারণে পিতৃপ্রতিম জগদীশকে তার যতটুকু যত্ন করার দরকার ততটা করে উঠতে পারেন না। এই বিজন-বিভূঁয়ে বৃদ্ধ মানুষটা একা এক আপনভোলা কাজের লোককে সম্বল করে পড়ে আছেন ভাবতেও কেমন কষ্ট হয় হিমানীর। ভেবেছিলেন, এবার এসেই দিনকয়েকের জন্য ছুটি দেবেন দশরথকে। কিন্তু, আজ সকালে যা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বাড়িতে আরো একটা বাড়তি পুরুষ মানুষের উপস্থিতিকে প্রয়োজনীয় মনে করছেন তিনি।

রাশভারী দাদুকে মা অক্লেশে বকাঝকা করলেও শিবানী অতটা পারে না। শ্বেতা তো পারলে জগদীশকে এড়িয়েই চলে। একসময় তার বাবা জগদীশের ছাত্র ছিলেন। কথায় কথায় তার প্রসঙ্গ উঠে এলে জগদীশের মুখের ভাবের এমন পরিবর্তন হয় যে শ্বেতা কোন কথা বলতে পারে না। পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে দাদুর এই নিবিড় যোগাযোগটুকুই দাদুর সাথে শিবানীর অন্তর্লীন মিলের কারণ।

কাল সন্ধেবেলায় ফেরার পর রিক্রিয়েশান রুমে ক্যারাম খেলার সময়েও দাদুর সাথে কয়েকটার বেশি বাক্য বিনিময় হয়নি শিবানীর। কিন্তু মনে হচ্ছিল বেড়াল বাড়িটার কাছ থেকে ফেরার পর আরো একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেছেন দাদু।

জলখাবার খেয়ে আপাদমস্তক শীতকালীন বৃষ্টির পোষাকে ঢেকে ওরা দুজন যখন অনুর বাড়ি পৌঁছল অনু তখন নিজেদের বারান্দায় বসে ওর পোষা কুকুর জলিয়নকে ডগ বিস্কুট খাওয়াচ্ছে। জলিয়ন পাংশুটে রঙের আইরিশ সেটার। গতবার দাদুর বাড়ি বেড়াতে আসার সময় সেটাকে

পুঁচকে একটা তুলোর বালিশ বলে মনে হত। এখন সেটারই চেহারা দেখে ওদের তাক্ লেগে গেল।

শিবানীদের বাড়িতে ঢুকতে দেখে অনু এমন চীৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল যে কয়েক সেকেন্ডের ভেতর বারান্দায় ওদের ঘিরে ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। অনুদের যৌথ পরিবার। আজ আবার অকাল বৃষ্টির কারণে বোধহয় কেউই বাড়ির বাইরে বেরোননি। ফলে অনুর বাবা, মা, ভাই মায় ফুটখানেকের একটা বাচ্চা ছেলের সাথে তার একমাত্র কাকা, কাকিমা—সকলকেই একসঙ্গে পাওয়া গেল। এখানে শিবানীর আলাদা খাতির। সকলেই তাদের দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। তাদের সাথে বেশ পরিচিত কারো মতই ব্যবহার করল জলিয়ন। শিবানী একটু সিঁটিয়ে থাকলেও শ্বেতা যখন তার মাথায় গলায় হাত বুলিয়ে দিল একটু লজ্জাও বোধহয় পেল কুকুরটা।

অনুর বাবা অর্ণব একটু সখি সখি ধরণের মানুষ। বাউলদের মত ঢুলু ঢুলু চোখ, লম্বা চুলের মানুষটা সাধারণ কোন কথা বললেও লোকে তার পেছনে লাগে। শিবানীরাও সুযোগ পেলে ছাড়ে না।

অনুদের বাড়িটা রাস্তার দিক থেকে দেখতে অবিকল উল্টো একটা ইংরাজী 'ইউ' অক্ষরের মত। বাড়িটা দু'পাশ দিয়ে বেড়ে ধীরে ধীরে রাস্তার দিকে এগিয়ে আসায় অর্ধগোলাকৃতি বারান্দাটার যে কোন অংশ দিয়েই কোন না কোন ঘরে ঢোকা যায়। বাঁদিকের প্রথম ঘরটার পাশে দোতলায় যাবার সিঁড়ি। অর্ণব মেয়ের বান্ধবীদের সাড়ম্বরে দোতলার বসার ঘরে নিয়ে এলেন।

মাড়োয়ারি গদির মত মোটা জাজিম, তোষক প্রভৃতির ওপর দুধসাদা বেডকভার চাপিয়ে চমৎকার বসার জায়গা করা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে ছোট ছোট বেশ কয়েকটা তাকিয়া। গদিটা এত বড় যে সেটা প্রায় গোটা ঘরটাই দখল করে রেখেছে। সেটা দেখামাত্রই তার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল শিবানী আর শ্বেতা।

অর্ণব একটু লাজুক মেয়েলি ভঙ্গীতে বললেন, সকালবেলায় সাহাবাড়িতে নাকি সাংঘাতিক সব ঘটনা ঘটে গেছে?

শিবানী বলে, সকালবেলা নয়। রাত দুটোর পর-টর থেকে সকাল ছ'টা সাড়ে ছ'টার ভেতর কোন একসময়।

অর্ণব একটু দুললেন। মেয়ের দিকে একবার তাকালেন। হাতদুটোকে অদ্ভুতভাবে মটকে শ্বেতার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা গেছলে নাকি?

শিবানী শ্বেতার হয়ে বলল, এখনও যাইনি, তবে দাদু গেছে। লাশটাশগুলো অবশ্য সকালেই চালান হয়ে গেছে।

—ভাগ্যিস দেখতে যাইনি। অর্ণব আলটপ্‌কা কথাটা বলে ফেললেন।

—শিবানী সুযোগটা ছাড়ল না। বলল, কেন, কাকু? ভয় পেয়েছিলে বুঝি?

অর্ণব প্রায় কাঁচু মাঁচু ভঙ্গীতে নাটকীয়ভাবে বললেন, তা একটু পেয়েছি বটে, ভাই! তার ওপর কাল রাত দুপুর থেকে অত বেড়ালের ডাক। তোমার কাকিমা তো বললেন, যত সব অলক্ষুণে কান্ড।

শিবানী আর শ্বেতা দ্রুত মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল। দৃশ্যটা অনুর চোখ এড়াল না। অর্ণব ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতেই সে ওদের দুজনকে চেপে ধরল, কি ব্যাপার রে? তোরা যেন কিছু জানিস বলে মনে হচ্ছে?

শিবানী কথাটার উত্তর না দিয়ে বলল, তার আগে বলত, বেড়াল-বাড়িটায় কি কেউ থাকে?

—বেড়াল-বাড়ি! ওঃ। অনু মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। তারপর বলল, থাকত না। তবে এখন থাকে। একটা ছেলে দারুণ হ্যান্ডসাম। আমি

দেখেছি। কয়েক মাস ধরেই আসছে। এটা অবশ্য কেউ জানে কিনা সন্দেহ। তবে, কাল থেকেই বোধহয় ও পাকাপাকিভাবে ওখানে থাকতে শুরু করছে।

— এ'রম একটা বাড়িতে একলা একটা ছেলে—কেউ জানে না বলছিস কেন? শ্বেতা অধীরভাবে জিজ্ঞেস করল।

—বোধহয় অত নজর করেনি কেউ। তাছাড়া যতবার এসেছে—দেখেছি তখন হয় সন্ধে না হয় রাত্রি। ছেলেটাও মিষ্টিরিয়াস। গোলমত একটা লণ্ঠন নিয়ে ঠুকঠাক কি যে করে। সকাল হলে টিকিটিও দেখতে পাইনা।

— কেউ কিছু বলেনা? মানে ঐ লণ্ঠনটা তো—

শিবানীর কথাটা অনু শেষ করতে দিল না। বলল, কি আর বলবে! পুরনো কথা ভেবে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সবাই জানে বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ঐ ছেলেটাই কিনেছে। তাছাড়া বলার মত কিছু যখন ঘটেওনি—

—না, ঘটেছে। গম্ভীর গলায় বলল শিবানী, আমার মন বলছে, ও বাড়িটায় এমন কিছু চলছে যা থেকে কারোরই ভাল হবেনা।

নিজের অজান্তেই শ্বেতা বলে উঠল, ঠিক যা আমার বাবার ক্ষেত্রে ঘটেছে।

শিবানী চকিতে একবার শ্বেতাকে দেখে নিল। তারপর অনুকে বলল, আজ তুই আমাদের বাড়িতে শুবি। রাত্রিবেলা এমন কিছু তোকে দেখাব—

অনু এবার হেসে ফেলল। বলল, অ্যাই! ভয় দেখাবি না। জানিস ভয় পেলে আমার কি হয়?

শ্বেতা অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক স্বরে বলল, কোন বাঘকে যদি মাল্টিজিমে ব্যায়াম করতে দেখতাম তাহলে সেটাও তোকে দেখবার জন্য ডাকতাম, নিশ্চিত। এটা সত্যিই একটা সিরিয়াস ব্যাপার। ঘটনাটা যদি অনিবার্য হয় তাহলে রাত হলে এমনিতেই সব বুঝে যাবি।

অনু খানিকটা সময় চুপ করে রইল। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতিটা বিচার করে বলল, সাহাবাড়িতে আজ যা ঘটল তার সাথে যোগাযোগ আছে এমন কোন ব্যাপারের কথা বলছিস না তো?

শিবানী বলল, এখানে বসে আর কিচ্ছু বলা সম্ভব না। দাদু বাড়ি ফিরলে মন দিয়ে ওঁর কথাগুলো শুনে নেব। তুই কিন্তু সন্ধে নামার আগেই চলে আসবি। একদম দেরি করবি না।

—আজকের এই দিনে! নিশ্চিন্ত থাক। সঙ্গে ভাই বা বাবা কেউ থাকবে। দুজন একসঙ্গেও থাকতে পারে।

শিবানী আর শ্বেতা উঠে দাঁড়ল।

অনু বলল, এ কি! কিছু খেয়ে যাবি না?

—খেয়েই এসেছি। তুই কিন্তু সন্ধে করবি না। তার আগেই—

শ্বেতার হাত ধরে শিবানী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে আর কারো সাথে কথা বলার দিকে না গিয়ে সোজা রাস্তায় নেমে এল।

রাস্তার এখান থেকে মাঠের আরেক দিকে জগদীশকে দেখা যাচ্ছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে বর্ষাতির পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে সম্ভবত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেষ্টায় হনহন করে হাঁটছেন। শিবানী দাদুকে চীৎকার করে ডাকতে আরম্ভ করল।

জগদীশ ওদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের বাড়ির কাছাকাছি এসে শিবানীকে বললেন, এমন বিচ্ছিরি জলকাদার ভেতর না বেরোলেই পারতিস। তার ওপর এ'রম ঠান্ডা পড়েছে!

—কি করব, দাদু। অনুর সঙ্গে দেখা না করলেই নয়। ওকে ডিনারে ইনভাইট করে এলাম, তাছাড়া রাত্তিরবেলাতেও ওকে আমাদের সাথে থাকতে বলেছি। শিবানী আদুরে গলায় বলল।

—ভালই করেছিস একদিক থেকে। জলের ভেতর বেড়াল দুটো। এ'রম চললে কোন বিপদ নেই।

—কি সব বলছ? শিবানী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—না, বলছি বেঁড়ালেরা ভীষণ জল এড়িয়ে চলে তো।

—এর মাঝখানে বেড়াল আসছে কোত্থেকে!

সম্বিৎ ফিরে পান জগদীশ। মৃদু হেসে বলেন, রথীনকাকাকে মনে আছে?

—বাবার বন্ধু ছিলেন না? এই থানাতে তো আছেন।

—বন্ধু 'ছিলেন' বলিস না। এখনও আছেন। তা, ...ও এসেছিল। কি বলে গেল জানিস?

সাহাদের বাড়িতে যে খুনগুলো হয়েছে, যার জন্য সকালবেলায় অত লোকজন এল, সেগুলো নাকি কয়েকটা বেড়ালের কাজ!

লন পেরিয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখেই বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে গেল দুই বান্ধবী। কথাগুলো যেন অলৌকিক কোন বার্তা নিয়ে আসছে।

দাদুর দিকে একবার তাকাল শিবানী।

জগদীশবাবু যন্ত্রের মত তাদের পেরিয়ে গিয়ে গামবুট খুলে হাতে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

শ্বেতার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। শিবানী তাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে লিভিংরুমে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল।

একটু পরেই হিমানী আর প্রকাশ এসে ঘরে ঢুকলেন।

শিবানী বলল, কি ব্যাপার বলত মা? মার্ডারগুলো নাকি কতগুলো বেড়াল—

হিমানী চকিতে শ্বেতাকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, কে বলছে এসব? বাবা বোধহয়! সারাদিন বাচ্চাদের মত ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে এখন তোদের মাথাতেও সে সব চালান করতে শুরু করেছে!

হিমানীর কথার সুরে হোক বা অন্য কোন কারণে শ্বেতার মুখের মেঘ কেটে গেল।

প্রকাশ বললেন, ও বাড়ির ছোট্ট একটা কাজের মেয়ে আছেনা? ও নাকি কাল সন্ধেয় বুধুয়া আর ওর বৌ-কে বাখারি দিয়ে কতগুলো বেড়ালছানাকে পিটতে দেখেছে। এটা ঘটনা যে গোটা জায়গায় ... মানে, মাটিতে, খাটিয়ায় সবেতেই প্রচুর বেড়ালের লোম পাওয়া গেছে। একটা কথা অবশ্য তোদের না বললেই নয়। যে পরিমাণ লোম পাওয়া যাচ্ছে সেটা একটু আশ্চর্যজনক। মুঠো মুঠোও বলতে পারিস। আসলে ড্রাইভার আর ওর পরিবার এসে ঘরখানা দখল করার আগেই ঐ ঘরেই অন্তত গোটা দশক বেড়াল ছিল—একেবারে ছানাপোনা সমেত। রাস্তার ধারেই তো ঘরখানা। লোমটোমগুলো স্বাভাবিক কারণেই ওখানে জমেছে নিশ্চয়ই কখনো পরিষ্কার করানো হয়নি বলেই। ফলে, স্রেফ এর জন্য মার্ডারগুলোর

সঙ্গে বেড়ালদের রিলেট করানো আমি মানছি না। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এলে দেখবি, অন্য ব্যাপার। শুধু একটা ঘটনা—

—কি! শ্বেতার উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে।

—ঐ বাচ্চা মেয়েটা বলেছে, ভোররাতে ও যখন জল খেতে উঠেছিল তখন জানলা দিয়ে গাড়ি বারান্দার আলোয় ও নাকি একদল বেড়ালকে লাইনবন্দী হয়ে নিঃশব্দে বাড়িটায় ঢুকতে দেখেছে। এটা রথীন বিশ্বাস করেছে। কারণ, এতখানি গল্প বানিয়ে বলার মত বিদ্যেবুদ্ধি মেয়েটার নেই।

একটু ইতস্তত করে সবটুকু না বলে পারলেন না প্রকাশ।

হিমানী বললেন, এটার কারণ আমি বলতে পারি। আসলে বেড়াল-পরিবারটা জায়গাটার মায়া কাটাতে পারেনি। তাই হয়ত একবার ঘুরে গেছে।

—আহা! একদম উদ্বাস্তু হয়ে গেছে না? প্রকাশ এমন করুণভাবে কথাটা বললেন, যে শিবানী আর শ্বেতা হো হো করে হেসে উঠল।

পরিবেশটা সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনেছেন এ ব্যাপারে হিমানীর কোন সন্দেহ নেই। তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রকাশকে একবার চোখ টিপে উঠে দাঁড়ালেন।

প্রকাশ শিবানীদের বললেন, তোরা এবার ওঠ্। স্নান, খাওয়া সেরে নে। তোরা না গেলে বাবাও খেতে বসবে না। আর শোন্, মনোতোষকাকা বলেছে, শুভ্রা কাল আসতে পারেনি বলে খুব লজ্জিত। রানাঘাটে মানসীদের নতুন বাড়ি থেকে কি একটা খারাপ খবর পেয়ে চলে গিয়েছিল ও। আজ বিকেলেই এখানে চলে আসবে। হিমানী প্রকাশের সাথে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে

গেলেন। শ্বেতা ধরা গলায় বলল, মানসীর আবার কি হল? ওর খারাপ কিছু হলে—

—তুই থামতো! শুভ্রা এলেই তো জানতে পারবি।

—আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে...

—আঃ! তুই থামবি? শিবানী যেন বন্ধুকে না, পরোক্ষে নিজেকেই আটকাল। বলল, উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য হার্টস অব চিকেন! লেট হার কাম।

শ্বেতা তবুও থামল না। বলল, আমাদের বেলা থাকতে থাকতেই ঐ বাড়িটায় একবার ঢুকে সবকিছু দেখে আসা উচিত ছিল। তুই কাল বলেছিলি—

—ওহ্; ডোন্ট বি ফুলিশ! মালিকের উপস্থিতিতে তার বাড়ি সার্চ করবার মত গাড়ল আমরা নই। ঢুকলে কি বলতিস, উই আর ইন সার্চ অব সাম ... সাম কীলার ক্যাটস।

শিবানী রাগ চেপে রাখতে পারেনা।

৮

গতকাল রাত্রে ঘটে যাওয়া ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তির অপেক্ষায় চার বান্ধবী একত্রিত হয়েছে। শুভ্রা এসেছে ঠিক একঘণ্টা আগে। তার দাদু তাকে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। শুভ্রা এসে অবশ্য কোন শোক সংবাদ দেয়নি বরং ঠিক উল্টো খবর দিয়েছে। বহুদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে মানসী কোন একটা গুরুগম্ভীর খবর ফোন মারফৎ পাঠিয়ে তাকে কায়দা করে রানাঘাটে নিজেদের বাড়িতে টেনে গিয়েছিল। আসলে মানসীদের বাড়ির সকলে ডাকাবুকো চরিত্রের শুভ্রাকে ছোটবেলা থেকেই খুব পছন্দ করেন।

সরকারবাগানের বাস উঠিয়ে হঠাৎই রানাঘাটে বাড়ি করে চলে যাওয়ার জন্য মানসীদের ওপর শুভ্রার একটু শিশুসুলভ অভিমান ছিল। কিন্তু, রানাঘাটে পৌঁছে ও যখন শুনল, মানসীর বিয়ে ঠিক হয়েছে এবং পাত্রটি শুভ্রাদের থেকে গোটা তিনেক ব্লক পেছনেই থাকে, তখন তার যাবতীয় ক্ষোভ কোনও এক যাদুমন্ত্রে উধাও হয়ে গেল।

খাওয়ার পর মিনিট তিরিশেক সেই মেয়েলি গল্পই চলছিল। মানসী কতটা মোটা হয়েছে, তার হবু হ্যাজব্যান্ডের ফিজিক দেখে কি কি সিদ্ধান্তে আসা যায়—এইসব উদ্বায়ী ব্যাপারই আলোচনার বিষয়বস্তু এবং এক পরীক্ষাসংক্রান্ত কোন ঘটনা ছাড়া যেহেতু ওরা কোনদিনই অন্য কোন ব্যাপারেই কোন আশাব্যঞ্জক ফলাফলে পৌঁছতে পারেনি, সেহেতু ভাবনার জট ছাড়াতে অর্থাৎ মানসীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য সকলে মিলে টেলিফোনটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু, ওদের সকলকে চরম হতাশ করে দিয়ে ফোনটা ধরলেন মানসীর বাবা, আর তিনি খুবই সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন মানসী তার হবু বরের সাথে মাঝেরগ্রামে তার হবু মাসিশাশুড়ীর বাড়িতে বেড়াতে গেছে।

হতাশভাবে রিসিভারটা ক্রেডেলের ওপর রেখে শিবানী বলল, কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস।

শুভ্রা বলল, অমন বলিস না। যা শুনছি, তাতে আমাদের ভেতর একজনের যে কোন দুশ্চিন্তা নেই এতে আমি খুশিই হচ্ছি। অবশ্য কাল আমি নিজের চোখই ওকে টেনশন ফ্রী—

অনু শুভ্রাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমার বনে হচ্ছে ও এসকেপ করে গেলেও আমার নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। টিভিটা একটু খোলনা, বাবা। যা সব শুনছি তাতে একটু রিল্যাক্সড মুডে থাকা দরকার।

শিবানী টিভি সেটটা অন্ করে দিল। একটা চ্যানেলে কোন একটা ফ্যাশন প্যারেডে সুন্দরীদের ক্যাট-ওয়াকিং-এর কায়দা কানুন দেখান হচ্ছে।

শ্বেতা বলল, অসহ্য! অন্য চ্যানেল ধর।

শিবানী তাই-ই করল। এবার ডিসকভারী চ্যানেল। কাবুলি বেড়ালদের লাইফ স্টাইল দেখান হচ্ছে। শিবানী সুট্ করে চ্যানেল চেঞ্জ করল। স্টার মুভিজ-এর ছবি শুরু হচ্ছে। টাইটেল কার্ড পড়ল। ব্যাকগ্রাউন্ডে মধ্যযুগীয় একটা দুর্গপ্রাচীর। তার ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা কালো বেড়াল। ছবির নাম 'দ্য ব্ল্যাক ক্যাট'।

অধীরভাবে রিমোট কন্ট্রোলারটা হাতে তুলে নিল শ্বেতা। একটার পর একটা চ্যানেল বদলে যেতে থাকল। প্রতিটাতেই বেড়ালের ব্যাপার। যে চ্যানেলটায় এসে শ্বেতা হাল ছেড়ে দিল সেটাতে একটা পুরনো বাংলা ছায়াছবি দেখান হচ্ছে। পর্দায় একটা রান্নাঘর দেখা গেল। ঘরটার এদিকে ওদিকে ছড়ান দু'তিনটে পিঁড়ে। আর প্রতিটি পিঁড়ের সামনে একেকটা এঁটো থালা। বোঝা যায়, খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাড়ির সবাই ভেতরে গেছে, কেননা—থালাগুলোর ওপর হামলে পড়েছে বেশ কয়েকটা বেড়াল।

টিভিটা অফ্ করতে গিয়েও পারল না শ্বেতা। তার মাথাটা কেমন করছে। শুভ্রা বলল, কি হল রে? তোর কি শরীর খারাপ লাগছে?

শ্বেতা কোনমতে বলল, নাঃ। কি হচ্ছে, দ্যাখ্। পর্দার দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকল সবাই। বেড়ালগুলো থালা টালা ছেড়ে সোজা এগিয়ে আসছে ক্যামেরার লেন্সের দিকে। এক্সটিম ক্লোজ আপে ওদের গুঁফো মুখগুলো ভয়ংকর দেখাচ্ছে। নিমেষের ভেতর টিভিটা অফ্ করে দিল অনু।

বেড়াল-বাড়ির দিকটার জানলা দিয়ে হু হু করে শীতের বাতাস আসছে। সেই কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার কামড়ে সকলেরই যেন একসঙ্গে মনে পড়ে গেল কি কারণে তারা আজ এখানে অপেক্ষা করে আছে। শুভ্রা আর অনুকে ভাসাভাসা ভাবে শিবানী যা বলেছে তাতে ওদের উত্তেজনা

বেড়েছে বৈ কমেনি।

টিভির ব্যাপারটা মাথা থেকে জোর করে সরিয়ে জানলার বাইরে চোখ মেলল শিবানী। আগের দিন দেখা ছেলেটা আবার তার নির্দিষ্ট চেয়ারটায় এসে বসেছে। তেপায়ার ওপর ঠিক আগের দিনটার মতই অদ্ভুত গোল আলোটা জ্বলছে আর সেটাকে ঘিরে বৃত্তে বৃত্তে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে বেড়ালের দল।

রুদ্ধশ্বাসে দেখছিল সকলে। হঠাৎ বেড়ালদের দলটায় কোন একটা অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করে দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠল শ্বেতা। শিবানীকে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে সে বলল, একটা জিনিষ দেখছিস?

শিবানী বলল, কি বলত?

শ্বেতা বলল, সামনের সারিটা দ্যাখ। তিনটে জায়গা ফাঁকা। তিনটে বেড়ালের বদলে ওখানে তিনখানা পাথরের টুকরো সাজান।

শিবানীর মুখখানা সাদা হয়ে গেল। অস্ফুটে সে বলল, তার মানে তিনটে বেড়াল মিসিং! বুধুয়ারাও তিনজন ছিল না?

শ্বেতা জানলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একবার নির্বোধের দৃষ্টিতে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

অনু আর শুভ্রা কিছুই বুঝতে পারছিল না। তবুও ছোঁয়াচে রোগের মত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছিল সকলের ভেতরে।

ছাদের ওপরে ছেলেটার হাত দুটো দ্রুত লয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল। আজ আর বেড়ালগুলোকে ততটা শান্ত দেখাচ্ছে না। ছাদের ওপর পায়চারী কবতে করতে শরীর মুচড়ে অদ্ভুতভাবে ডাকছে সবাই। মেঘ কেটে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। অসংখ্য তারাও দেখা যাচ্ছে। ছেলেটিকে কেন্দ্রে রেখে বেড়ালগুলো উপরদিকে মুখ তুলে অদ্ভুতভাবে ডেকে চলল। ঘুরে

ঘুরে। একটানা। যেন অসংখ্য শিশু কাঁদছে। ছেলেটির হাত দুটো এত দ্রুত ওঠানামা করছে যে শিবানীদের মনে হল, কোন অতিকায় পাখি যেন সর্বশক্তি দিয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

ওদের উত্তেজনা যখন তুঙ্গে উঠে গেছে ঠিক সেই সময়ে হঠাৎই একটা চাপা শব্দ করে লন্ঠনটা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। ঠিক যেন কোন একজন ঢিল ছুঁড়ে লন্ঠনটা চুরমার করে দিল।

নীচের মাঠের দিকে তাকাল শিবানী। মনে হল, সাদা চাদর গায়ে কেউ দ্রুত বেড়াল-বাড়িটার দিকে এগিয়ে এসে পাশের রাস্তার অন্ধকারে মিশে গেল। জানলা দিয়ে এর বেশি দেখা গেল না।

ছাদের ওপর ততক্ষণে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ভাঙা লন্ঠনের তেলে আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে সোজা হয়ে বসে আছে ছেলেটা। বেড়ালের দল আগুনের দিক থেকে সরে জটলা পাকাচ্ছে আর ক্রমাগত গুঙিয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, কোন একটা বিশেষ অনুষ্ঠান একেবারে চরম মুহূর্তে এসে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে।

জানলাটা বন্ধ করে দিল শিবানী। শ্বেতা একটা ডিভানের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তার চোখের জল এখনও শুকোয়নি। অনু আর শুভ্রা ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে। তবে, বহুদিন আগে দেখা একটা ঘটনা আর আজকেই পাড়ার বুকে ঘটে যাওয়া তিন তিনটে হত্যাকান্ডের সঙ্গে মিশিয়ে এতক্ষণ ঘটতে থাকা দৃশ্যাবলীর ভেতর অর্ন্তনিহিত মিলটুকু ওরা অনুভব করছিল।

শিবানী বলল, যা দেখলাম, জানিনা তার পেছনে খারাপ কোন কিছু আছে কি না! কেননা, বেড়ালগুলো আর ওদের মালিকটিকে আমরা ওদের নিজস্ব জায়গাতেই দেখতে পেয়েছি। ইভ্‌ন উই ডোন্ট সী দেম ট্রেসপাস এনিহোয়ার। কোন মানুষ তার পোষা জীবদের নিয়ে নিজের বাড়িতে

চরম অদ্ভুত কিছু করলেও বলার কিছু থাকে না, কারণ বাড়িটা তার নিজের।

অনু বলল, দোতলার ঘরদুটোর পাশের ঐ একফালি ছাদ যে আমাদের বাড়ি থেকে নজরে আসেনা সেটা বোধহয় তুই আগেই আন্দাজ করেছিলি?

শিবানী শান্তভাবে বলল, বুঝতে পেরেছিস দেখছি! হ্যাঁ, আমি সেজন্যই তোকে এখানে ডেকে এনেছি। আমার মনে হয়, সেই মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় ও বাড়িতে আমরা যে আবিষ্কারটা করেছিলাম সেটা আমাদের কারোর পক্ষেই ভাল ফলাফল নিয়ে আসেনি।

শুভ্রা বলল, অনেকক্ষণই এই আরব্য রজনীর গল্প শুনছি। আমাদের আদৌ কি কোন ক্ষতি হয়েছে?

শ্বেতা বলল, তোদের হয়নি। কিন্তু আমার হয়েছে। আমার বাবার ঘটনাটা তো তোরা জানিস। হয়ত ভাবিস, সাধারণ কোন দুর্ঘটনায় আমাদের এ'রম সর্বনাশ হয়েছে। তা কিন্তু নয়, আমি স্বপ্নের ঘোরে দেখতে পাই বাবার আসলে কি হয়েছিল।

অনু ভয় পাওয়া গলায় বলল, কি দেখিস তুই?

কেমন এক তন্দ্রালু ভঙ্গিতে শ্বেতা বলল, দেখি.... অন্ধকার বি টি রোড ধরে বাবা ব্যারাকপুরের দিকে গাড়ি চালিয়ে আসছেন। রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। মাঝে মাঝে এক একটা লরী সোজা অথবা উল্টোদিক থেকে এসে সাঁ করে আমাদের ছোট্ট ফিয়াটখানাকে পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। রাস্তার একটা বিশেষ জায়গায় এসে গাড়িটা থামিয়ে দিতে বাধ্য হতে হল বাবাকে। একটা কালো বেড়াল রাস্তা পেরোচ্ছে। ড্রাইভারদের স্বাভাবিক কুসংস্কার বাবাকে থামিয়ে দিলেও বেড়ালটা সম্ভবত অন্য কিছু ভাবছিল। রাস্তাটা

না পেরিয়ে একেবারে আকস্মিক ভাবে ফিয়াটটার কাছাকাছি এসে একলাফে ওপরে উঠে এল। উইন্ড স্ক্রীনের এ পাশে বাবা, ও পাশে বেড়ালটা। দুজনে চোখাচুখি হল। বাবার ভেতর কি একটা যেন হয়ে গেল। বেড়ালটাকে চোখের সামনে রেখেই গাড়িটা চালিয়ে দিলেন তিনি। একটা ওয়াইপার আঁকড়ে বেড়ালটা প্রায় দোল খেতে আরম্ভ করল। বাবা গাড়ির স্পীড আরো বাড়িয়ে দিলেন।

গাড়িটা যখন অয়্যারলেস গেটের কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন বাবার সামনের দিকে থেকে একটা ট্রাক দারুণ গতিতে ছুটে এল। বেড়ালটা যেন ওটা আসার অপেক্ষাতেই ছিল। রবারের মত শরীরটা বাঁকিয়ে বাবার ঠিক ডানহাতি জানলাটার কাঁচ নখে চেপে দু'এক সেকেন্ডের ভেতরই স্প্রিং এর মত, অথবা জোঁক যেমনভাবে মাটির ওপর দিয়ে এগোয় সেভাবে সরাসরি বাবার কোলের ওপর গিয়ে পড়ল।

স্বাভাবিক থাকার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও একবার শিউরে উঠল বাবার শরীরটা। বেড়ালটা আবারও তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। কি অদ্ভুত সেই দৃষ্টি। মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। স্টিয়ারিং হুইলে সেঁটে থাকা বাবার হাত দু'খানা যেন দারুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। উল্টোদিকের ট্রাকটা তখন ভীষণই কাছে এসে পড়েছে। বাবা ক্ষিপ্তের মত ওঁর ছোট্ট গাড়িটা নিয়ে সেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আঃ! শব্দটা বেরিয়ে এল অনুর মুখ থেকে।

একটা দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে শ্বেতা বলল, সবটাই স্বপ্ন। কিন্তু, যখন দেখি রক্তাপ্লুত বাবার শরীরটার ওপর বেড়ালটা পাশবিক খিদে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন... তখন...। আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে শ্বেতা। ভাঙা গলায় বলে, এই একই দৃশ্য আমি বহুদিন ধরে দেখে আসছি। কোন ভিডিও ক্যাসেট বারবার রিওয়াইন্ড করে কেউ যেন আমাকে সেটা দেখতে বাধ্য করছে।

শুভ্রা অনেকক্ষণ সময়ই গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্বেতার কথা শুনছিল। হঠাৎ সোফা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যথেষ্ট হয়েছে,

আর নয়। বেড়ালের ব্যাপারটা এবার মানসীকে ফোনে জানিয়ে দি। ও তো আর আমাদের সঙ্গে নেই আর তাছাড়া এত রাত অব্দি ছেলেটার সাথে নিশ্চয়ই ও হাওয়া খাচ্ছেনা। এখনই ও কে সব না বললে পরে হয়ত এ সুযোগ আর নাও আসতে পারে।

অনু বলল, কি দরকার ওকে ভয় পাইয়ে দেবার। বেচারি সবেমাত্র একটা নতুন জীবনে ঢুকতে যাচ্ছে। এ সময়—

ডায়াল করে রিসিভারটা কানে চেপে ধরে রেখে শুভ্রা বলল, আমাকে অতটা ন্যাদোস মনে করিস না। রেখে ঢেকে বললে—

কথা বলতে বলতে শুভ্রার মুখের ভাব বদলে গেল। বোঝা গেল ফোনটা কেউ ধরেছে।

শিবানী উঠে দাঁড়ল। করিডরে বেরিয়ে এসে দাদুর লাইব্রেরী রুমের দিকে এগিয়ে চলল। আজ রাত্রে আর ঘুম আসবে না, তার বদলে বরং কয়েকটা কমিকস নিয়ে বসা যাক।

লাইব্রেরী রুমের কাছাকাছি আসতেই কোথাও থেকে একটা গুড়গুড় আওয়াজ ভেসে এল। এত রাত্রে কোলাপসিবল গেট বন্ধ করার শব্দ। বারান্দার একটা অন্ধকার কোণ ঘেঁষে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল শিবানী।

একতলার খিড়কির দরজাটা কেউ খুলে এসেছে। সিঁড়ি বেয়ে কারোর ওপরে উঠে আসার হাল্কা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল শিবানী। তখন আর নিজের ঘরে ফিরে যাবার কোন উপায় নেই। দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা ঠিক করিডরের মাঝখানে উঠে এসেছে। ঘরে ফিরতে গেলে ওখান দিয়েই যেতে হবে।

কোনমতে শ্বাস চেপে রইল শিবানী। নিজের বুকের ঢিব্‌ঢিবানির শব্দও তাকে চমকে দিচ্ছে। শিবানীর যখন মনে হচ্ছে এবার ও হয়ত অজ্ঞান

হয়ে পড়বে ঠিক সেই মুহূর্তেই সিঁড়ির ওপরের ধাপ থেকে করিডরে পা রাখতে দেখা গেল জগদীশকে। সারা শরীরে সাদা চাদর জড়ান দাদুকে চিনতে প্রথমটা একটু কষ্টই হল শিবানীর। এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলেন দাদু? খিড়কির দরজা দিয়ে চোরের মতই বা ঢুকলেন কেন? তবে কি একটু আগে মাঠের ভেতর দাদুকেই দেখেছে সে?.

মাঠের ভেতর থেকে ঢিল বা অন্যকিছু ছুঁড়ে ছেলেটার লণ্ঠনটা তাহলে দাদুই ভেঙে দিয়েছেন? কিন্তু কেন?

শিবানীর মাথাটা ভন্‌ভন্ করছিল। জগদীশ তখন গা থেকে চাদরটা খুলে সযত্নে ভাঁজ করে কাঁধের ওপর রেখে ধীরে ধীরে লাইব্রেরী রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন।

দেয়ালের গায়ে অন্ধকারে মিশে থাকা শিবানী দেখল, দাদু সোজা লাইব্রেরী - রুমের কাছে গিয়ে সন্তর্পনে দরজাটা খুলে সুট্ করে ভেতরে চলে গেলেন।

শিবানী একদৌড়ে ঘরে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবল। কিন্তু, কয়েক সেকেন্ড বাদেই আবার বাইরে বেরিয়ে এলেন জগদীশবাবু। হাতে একটা রেক্সিনে বাঁধানো ঢাউস বই। বইটা নিয়ে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে জগদীশ একবার মুচকি হাসলেন, তারপর নিজের শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন। হাসিটা কাঁটার মত বিদ্ধ করল শিবানীকে। কোন একজনের উপস্থিতি নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন দাদু।

দাদুর এই লুকোচুরি খেলার কারণ কি হতে পারে চিন্তা করতে করতে ঘরে ফিরে এল শিবানী। কমিক্‌সের কথাটা সে বেমালুম ভুলে গেছে।

ঘরে এসে ঢুকতেই তাকে দেখে প্রায় লাফ দিয়ে উঠল সকলে। শুভ্রা বলল, মানসীকে সব জানাতে ও কি বলল জানিস!

শিবানী চঞ্চলভাবে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ বল।

—ও বলল, বেড়ালদের ও অসহায় জীব ভেবে প্রতিপালন করে। ও যখন আমাদের ফোন পেয়েছে তখনও ওর বিছানার একটা পাশে গোটা তিনেক বিড়াল ছানা নাকি ঘুমিয়ে একেবারে কাদা। এমনও বলল, হবু যজ্ঞি বাড়ির ডিনারের চাপটা নাকি বেচারারা সহ্য করতে পারছে না।

শিবানী একেবারে হাঁ হয়ে গেল।

৯

রাত্রিবেলা রথীন এসে গোপনে তাকে যা বলে গেছেন তাতে জগদীশের সিদ্ধান্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বহুদিন ধরে বহু বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করে ইতর জীবদের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা তার তৈরী হয়ে গেছে। তবে, তার ঠিক নাকের ডগায় যে ঘটনাটা ঘটেছে তার গতিপ্রকৃতি তিনি না বুঝলেও একটা সুতো অন্তত ধরতে পেরেছেন, যদিও তার আরেকপ্রান্ত ধরে কি ভাবে খেলা হচ্ছে সেটা তার বোধগম্য হচ্ছে না।

কুয়াশার একটা চাদর সরকারবাগানকে প্রেমিকার মত নিবিড় আলিঙ্গনে ধরে রেখেছে। জানলার বাইরে সেদিকে তাকাতে অদ্ভুত এক অনুভূতি ঘিরে ধরছিল জগদীশকে। এতগুলো বছর তাকে সরকারবাগানে থাকতে হয়েছে—বহু সমস্যার এমনকি কিছু যৌন কেলেঙ্কারীর মীমাংসা পর্যন্ত পরিস্থিতির চাপে পড়ে তাকেই করতে হয়েছে কিন্তু এ'রম উদ্ভট ব্যাপারের সন্মুখীন হওয়া তার জীবনে এই প্রথম।

কুয়াশা সরিয়ে সকাল আসার এখনও ঢের দেরি। কিন্তু, জগদীশ নিশ্চিত, খুনের সংখ্যা আরো বাড়বে। পরশু রাতে ছেলেটিকে ছাদে বেড়ালদের সাথে দেখার কয়েক ঘণ্টার ভেতর বুধুয়াদেব ওপর বিভীষিকার ছায়া নেমে এসেছে! হ্যাঁ, এটাই প্রক্রিয়া। কোন একটা

পদ্ধতিতে বেড়ালদের বশীভূত করে তাদের রক্তপিপাসু করে তোলা। আলোটা ভেঙে দিয়ে আজকের মত কোন সর্বনাশ হয়ত ঠেকালেন। কিন্তু, আবার পরবর্তী রাতেই যদি বেড়ালের দল জেগে ওঠে, তাহলে? আর, তারও পর—

আর ভাবতে পারলেন না জগদীশ। চারটের সময় তিনি লাইব্রেরীতে এসে বসেছেন।

সারা রাতটাই কেটেছে নিদ্রাহীন অবস্থায়। এখন দারুণ আচ্ছন্ন মনে হচ্ছে নিজেকে। ক্লান্তিতে দু'হাতের ওপর মাথাটা নামিয়ে আনলেন। জগদীশ একসময় ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

কাঁধের ওপর আলতো আঙুলের ছোঁয়ায় জগদীশের ঘুমটা যখন ভাঙল তখন শীতের রোদ এসে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা ভাসিয়ে দিচ্ছে। দু' চোখ মেলে তাকালেন জগদীশ। রথীন এসে দাঁড়িয়েছেন তার পাশে। একটু লজ্জিত হলেন জগদীশ। ছেলেটা কতক্ষণ এসেছে কে জানে।

রথীন বললেন, আপনি তৈরী হয়ে নিন, মাস্টারমশাই। এখনই গিয়ে বাড়িটায় ঢুকে পড়ি। এই সকাল-টকালই হানা দেওয়ার প্রশস্ত সময়।

জগদীশ সামান্য ভীত কণ্ঠে বললেন, বৌমা দেখেনি তো। ওকে কিন্তু বলেছি ন'টার পর আমাকে ডাকতে।

রথীন ঘড়ি দেখে বললেন, সবে সওয়া সাত। ওরা কেউ উঠলে আমি টের পেতাম। তাছাড়া, খিড়কির চাবি তো আপনি আমাকে দিয়েই রেখেছেন। আমরা ঘণ্টাখানেকের ভেতর ফিরে এলে কেউ কিস্যু ধরতে পারবে না।

একটু আশ্বস্ত হলেন জগদীশ। স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে রাতের চাদরখানাই জড়িয়ে বললেন, চল।

রথীন অবাক হয়ে বললেন, এভাবেই যাবেন?

জগদীশ বললেন, পাজামা পাঞ্জাবী তো রাত থাকতেই পরে রয়েছি। অসুবিধে কি! তাছাড়া এমনিই দেরী হয়ে গেছে। এখন আবার ধড়াচুড়া পরতে গেলে—

রথীন আর দ্বিরুক্তি করলেন না।

মিনিটখানেকের ভেতরই বাড়ির পেছন দিককার গেট খুলে দুজন খোলা মাঠে এসে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে পৃথিবী ভুলে গেলেন দুজন।

সোনা রোদ ঘাসের কার্পেটের ওপর জমে থাকা শিশিরের ওপর যেন শিউরে উঠছে। মিষ্টি একটা হাওয়া দিচ্ছে উত্তর দিক থেকে। এ'রম একটা পরিবেশে একটা জঘন্য কাজে হাত দিতে যাচ্ছেন ভেবে কষ্ট হল জগদীশের।

বাড়িটার সদর দরজায় সাবেক আমলের মত কড়া লাগান। জগদীশ সেটা বার কয়েক নেড়ে এদিক ওদিক দেখলেন। রথীন সিমেন্টের ব্যাগ আর ইটের পাঁজার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে কে জানে। দেয়ালের গায়ে লটকানো ছোট নেমপ্লেটটায় "একক মজুমদার" লেখা আছে দেখে মনোতোষের উল্লেখ করা পদবী সংক্রান্ত ব্যাপারটা মাথায় চলে এল জগদীশের। তার রহস্যপ্রিয়তা নিয়ে কি জঘন্য ঠাট্টাই না করতে পারে মনোতোষের মত বন্ধু। সারনেম কি না —মার্জার! ও!

বাড়িটার দরজাটা খুলতেই এক বা একাধিক বেড়ালের মুখোমুখি হতে হবে ভেবে সমস্ত শরীরটা শক্ত হয়ে যাচ্ছিল জগদীশের। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল দরজাটা খুলছে আগের দিনের সেই ছেলেটা। আজ তার পরণে খুব জেল্লাদার একটা ড্রেসিং গাউন। তীব্র ন্যাপথলিনের গন্ধ ভেসে আসছে সেটার থেকে। পরনের পাজামাটা দেখেও মনে হল সেটা এ যুগের নয়।

পলকহীন নিরাসক্ত চোখে ওদের দুজনকে দেখছিল ছেলেটা। জগদীশের শরীরের ভেতর এক রকমের অস্বস্তি বাসা বাঁধছিল। রথীন অবশ্য সেসব লক্ষ্য করলেন না। সোজাসুজি বললেন, অসময়ে বিরক্ত করার জন্য মাফ করবেন। আমি এখানকার থানার দায়িত্বে আছি। একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার, তাই এলাম।

এমন একটা অসময়ে রথীনের পুলিশি কথাগুলো ছেলেটা কেমনভাবে নিল জগদীশ বুঝতে পারলেন না, কেননা ছেলেটা প্রতিক্রিয়াহীন গলায় তাদের ভেতরে আসতে বলল।

রথীন সিভিল ড্রেসে আছেন। ছেলেটা চাইলেই যেন তার আইডেন্টিটি কার্ড দেখাতে পারেন এমন একটা ভাবনা থেকে পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। যেন নরকের দরজা তার কাছে হঠাৎ খুলে গেছে, অনুভূতিটা সেই রকমের। জগদীশেরও ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল, কেননা ঘরেরর যে জায়গাটায় একটা ভাঙা তক্তাপোশে ছেলেটা তাদের বসার জন্য নির্দেশ করেছে তার চারপাশে এখানে ওখানে ছড়ান ছোট ছোট প্রাণীর দেহের ভুক্তাবশেষ। পুরিষও ছড়িয়ে রয়েছে এখানে ওখানে। আরশোলা আর পিঁপড়ের দঙ্গল দেখলেন ওরা। প্রচন্ড দুর্গন্ধের বাতাবরণে সাবলীলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই। অসংখ্য ইঁদুরের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে যাদের শরীরের অর্ধেকটাই নেই। কয়েকটার অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ কেউ খুবলে তুলে নিয়েছে। রক্তে ভেজা মেঝেয় নীথর হয়ে পড়ে রয়েছে সবাই, আর সেই সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য মাছের কাঁটা যেগুলোর কোনটাই ফুটখানেকের কম নয়।

রথীনের মনোভাবটুকু যেন সময় নিয়ে পড়ে নিল ছেলেটি। বলল, এখানে বোধহয় আপনাদের অসুবিধে হবে। চলুন, খোলা মাঠে গিয়ে কথা বলি।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন রথীন আর জগদীশ। বেরিয়ে এসেই রথীন জিজ্ঞাসা করলেন, এ'রম একটা পরিবেশে থাকেন কি করে, মশাই? আমার তো ঢুকতেই বমি পেয়ে গেল।

জগদীশের মনে হল, ছেলেটার চোখ দুটো ধক্ করে একবার জ্বলে উঠল্। তবুও শান্তভাবেই সে বলল, ওখানেই আমি অ্যাট হোম ফীল করি।

রথীনের মুখখানা ঘৃণায় কুঁচকে গেল। আলতো পায়ে মাঠের ওপর পড়ে থাকা একখন্ড কাগজ সরিয়ে তিনি বললেন, মানুষের রুচির বিভিন্নতার বিষয়টা অনেকসময় নাকি দেবদেবীদের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে যাক্‌গে, আপনি হয়ত শুনেছেন এখানকার একটা বাড়িতে কাল ভোররাতে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন তিনজন। পোষ্টমর্টেম রির্পোট থেকে—

রথীনের কথা শেষ করতে দিল না ছেলেটি। একটু শ্লেষাত্মক গলায় বলল, এসব আমাকে বলছেন কেন? এর ভেতর আমি কিভাবে আসছি!

রথীন শান্তভাবে বললেন, আপনি আসছেন সে কথা তো একবারও বলিনি। শুধু বলতে চাই, পোষ্টমর্টেম রির্পোট থেকে জানা গেছে এতগুলো হত্যাকান্ডের কারণ কোন ছোট মাপের বেশ কিছু চতুষ্পদ প্রাণীর অতর্কিত আক্রমণ। রোঁয়া, নখের ভাঙা অংশ বিশেষ—যা যা সূত্র মৃতদেহ বা আশপাশ থেকে পাওয়া গেছে তাতে আমরা নিঃসন্দেহ এই কাজগুলো কিছু বেড়ালের। অবশ্যই স্বাভাবিক বেড়াল নয়। খুনী বেড়ালদের কথাও আমার অজানা। তাহলে—

—কেন? ছোট পাখি, ইঁদুর এসব তো বেড়ালরা আকছারই খায়। একটু আগেই তো এর ঘরে—

কথাটা শেষ করতে পারলেন না জগদীশ। সামনে দাঁড়ান ছেলেটি সম্ভবত হাসি চাপার চেষ্টাতেই ফুলে ফুলে উঠছে। কিন্তু, তার চোখ দুটো রথীনের চোখের ওপর থেকে সরছে না। সেদিকে তাকিয়েই গম্ভীরভাবে সে বলে উঠল, আপনি যে কথাটা বলতে পারছেন না আমিই বরং সেটা বলে দি। আমার এখানে থাকা কিছু বেড়ালের কথা আপনারা শুনেছেন।

হয়ত কোন কারণে সেগুলো নিজেদের বাঘ ভেবে ভুল করেছে। এমন হওয়াটা অস্বাভাবিক হলেও অসম্ভব কি? পাখি, ইঁদুর, মাছ খেতে খেতে বেড়ালগুলোর জিভ বদলাবার ইচ্ছের কথাও ভুললে চলবে না, আপনি যে লাইনে কথা বলছেন তাতে এখানে বেড়ালের অরুচি হওয়ার কথাও বলা যেতে পারে।

ছেলেটার মস্করায় রথীনের মুখখানা শক্ত হয়ে এলেও সহবত বজায় রেখে বললেন, ঠিকই বলেছেন কিন্তু বেড়ালগুলো যে আমার চাই। সত্যি কথা বলতে কি ঠিক এখানটাতেই ওদের পাওয়া যাবে কি না সে ব্যাপারে আমার নিজেরও সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখ্‌খুনি আপনি নিজের মুখেই স্বীকার করলেন, ওরা এখানেই থাকে। তা আপনার হেফাজতে নয় নিশ্চয়ই?

ছেলেটা এক মুহূর্ত ঠোঁট কামড়াল। জগদীশ দেখলেন, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলিটা ভালই জমে গেছে। কিন্তু, তাকে অবাক করে দিয়ে ছেলেটা বলল, আমার এখানে থাকার স্থায়িত্ব্য পুরো তিনদিনেও পৌঁছয়নি। বৃষ্টির জন্য প্রথমেই মিস্তিরিগুলোকে মিস্‌ করলাম। তার ওপর আজ সকাল হতে না হতেই যা শোনাচ্ছেন! আপনাদের টেরিটরিতে কোন নিউকামার এলে সবাইকে কি এভাবে হেকেল্‌ড হতে হয়?

একটু অপ্রতিভ হলেন রথীন। বললেন, আমাদের ভুল বুঝবেন না। এটা নীরস কর্তব্যকর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ইয়ে, তাহলে বেড়ালগুলোর এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় আপনাকে সঙ্গে পাবার আশা রাখলাম। কেননা, আমার ধারণা মেরে নিয়ে না গেলে ওদের কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না। আর, এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সাহায্য করতে পারেন আপনি। এখানে একদিনের বাসিন্দা হলেও আফটার অল ইউ ফীল অ্যাট হোম উইথ দেম।

একটা তীর্যক হেসে বক্তব্য শেষ করলেন রথীন।

ছেলেটার চোখদুটো আরেকবার জ্বলে উঠল। কুঁচকে উঠল সুন্দর মুখখানা। বলল, আমার আর কি! আপনাদের পাড়াতেই যখন এসব হয়েছে

তখন দায়িত্ব তো আপনাদেরই। তবে, মা ষষ্ঠীর বাহন। মারলে খারাপ কিছুও তো হতে পারে। দেখুন, হয়ত ঐ যাদের বাড়িতে এই দুর্ঘটনা হয়েছে সেখানেও এ'রম কিছু হয়েছিল। হয়েছিল কি?

—হ্যাঁ। যে তিনজন মারা গেছে তাদের অন্তত দুজন বেড়ালদের ওপর অত্যাচার করেছিল।

ছেলেটার কথার উত্তর দেওয়ার সময় হঠাৎ রথীন অনুভব করলেন ক্রমশ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন তিনি। কেমন একটা সুন্দর ঘুম ঘুম আবেশ তাকে ঘিরে নিচ্ছে, আর সেই সঙ্গে ক্রমশই ছেলেটিকে দারুণ বিশ্বস্ত এবং পাশাপাশি জগদীশকে একটা নোংরা সন্দিগ্ধচিত্ত বুড়ো বলে মনে হচ্ছে তার। রথীনের চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলতে বলতে ছেলেটা হঠাৎ একবার নিজের কানের একটা পাশ চুলকোল। তারপর নাকের ওপরটা চুলকে হাতটা নামিয়ে আনল গলায়। জগদীশ অবাক হয়ে দেখলেন, প্রায় বাঁদরের মত তৎপরতার সঙ্গে তাকে নকল করে চলেছেন রথীন।

জগদীশ টের পেলেন, এখানে এমন একটা কিছু ঘটছে যা ক্রমশই আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। যেন একটা স্নায়ুর যুদ্ধ চলছে রথীন আর ছেলেটার ভেতর। প্রথমটায় রথীনকে আত্মবিশ্বাসী মনে হলেও ক্রমশ তার ভেতর সপ্রতিভতার অভাব লক্ষ্য করছেন জগদীশ।

রথীনের আরো অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু ছেলেটার দিকে তাকিয়ে সব যেন ভুলে গেলেন তিনি। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলেন জগদীশ। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বিকট শব্দ করে খানিকক্ষণ যাবৎ পাওয়া হাঁচিটা হেঁচে ফেললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে যেন কোথাও কোন সুর কেটে গেল। খানিকটা সময় বিমূঢ় অবস্থায় কাটিয়ে রথীনও যেন আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

ছেলেটা রথীনের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জ্বলন্ত চোখে জগদীশকে দেখল। বলল, আপনাদের যা দেখার দেড়টা দুটোর ভেতর দেখে নিন।

আজ আমার প্লাস্টারিংটুকু না করালেই নয়।

জগদীশ দেখতে পেলেন, ছেলেটার মুখে প্রচ্ছন্ন পরাজয়ের ছায়া।

সামান্য কিছুটা সময়ই মাত্র সম্মোহিত অবস্থায় ছিলেন রথীন। কিন্তু, সেটুকুই তার পুলিশি আত্মসম্মানে এমনভাবে আঘাত করল, যে খানিকক্ষণ তিনি কথাই বলতে পারলেন না। জগদীশ বুঝলেন, একমাত্র তিনি সঙ্গে আছেন বলেই কোন পদক্ষেপ নেবার আগে চিন্তা করছেন রথীন। কারণটা আর কিছুই নয়, একে তো জগদীশ তার গুরু, তায় আবার এ বাড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় সন্দেহ তার মাথায় গুঁজেছেন স্বয়ং তিনিই। রথীনকে তিনিই ছেলেটির গত দু'রাত্তিরের কীর্তিকলাপের কথা জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, পরপর তিন রাত্তির যদি সে তার কালা যাদুর ব্যাপারটা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে পারে তাহলে অনেকরই সামনে ঘোর বিপদ।

ছোটবেলা থেকেই মাষ্টারমশাইয়ের কথার ওপর অন্ধ বিশ্বাস রথীনের। তাছাড়া, এখনও পর্যন্ত যা যা জগদীশ বলেছেন, কার্যক্ষেত্রে এসে দেখা যাচ্ছে সে সব কমই বলেছেন। প্রকৃত পরিস্থিতি আরোও কঠিন। ছেলেটা সম্মোহন জানে, বেড়ালদের সাথে তার একটা যোগাযোগও আছে। কিন্তু, একটা বাড়িতে মাত্র দু'দিনের বাসিন্দাকে খুনে মামলায় গ্রেফতার করার মত শক্ত কোন প্রমাণ তার হাতে নেই।

ছেলেটার দিকে ফিরে কঠিন শীতল স্বরে রথীন বললেন, তাহলে দুটোর ভেতর যে কোন একটা সময় ... আপনি তৈরী থাকবেন।

কথাগুলো উগড়ে দিয়ে রথীন হন্‌হন্‌ করে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। তার আর এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে নষ্ট করার মত ইচ্ছে নেই। জগদীশও তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ছেলেটা হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকল। রথীনকে ইঙ্গিতে এগোতে বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন জগদীশ। ছেলেটা তার কাছে এসে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মোলায়েমভাবে বলল,

আপনি আর এ বয়সে ক্রিকেটটা খেলবেন না দাদু। ওভার আর্ম থ্রো-ট্রো গুলো এত বেজায়গায় লাগিয়ে ফেলছেন—

কথাটা সম্ভবত ইচ্ছে করেই অসম্পূর্ণ রাখল ছেলেটা ।

জগদীশ জবাব দিলেন না। রথীনের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করার আগে শেষবারের মত ছেলেটির দিকে তাকালেন। স্পষ্টই জবাফুলের মত লাল হয়ে গেছে ছেলেটার চোখ দুটো। যেন মনে হয়, ফেটে এখনই রক্ত বেরিয়ে আসবে। অদ্ভুতভাবে দুটো হাত শূন্যে উঠে গেল ছেলেটার। বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য শব্দের এক স্রোত যেন তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসে সোজা ছুটে গেল জগদীশের দিকে।

কান দুটো চেপে ধরে কোনমতে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলেন জগদীশ। বুকের ভেতর যেন দামামা বাজছে। কানের পর্দা যেন এবার ফেটে পড়বে।

জগদীশের দিকে তাকিয়ে একবার তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বাড়ির ভেতর চলে গেল ছেলেটি।

দূর থেকে রথীন জগদীশের দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। মাষ্টারমশাই টলতে আরম্ভ করেছেন দেখে নিজেরই খানিকক্ষণ আগের অবস্থাটার কথাটা তার স্মরণে এল। চীৎকার করে জগদীশকে ডাকতে ডাকতে মাঠের মাঝখান ধরে দৌড়ে তার কাছে চলে এলেন রথীন। জগদীশ ততক্ষণে ধাতস্থ হয়েছেন। রথীনকে বললেন, তোমার চীৎকারটাই এক্ষেত্রে কাজে এল। অ্যাকিউট স্টেজে পৌঁছে গেলে খুব খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারত।

রথীন দাঁতে দাঁত চেপে বললে, মাষ্টারমশাই। আমাদের নিয়ে খেলার পরিণতি আমরা নিজেরাই টানব। দেখে নেবেন।

খুব তাড়াতাড়িই আজ যেন রাত্রি নেমে এসেছে সরকারবাগানে। পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন কুয়াশা পড়েছে জবর।

লিভিংরুমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছিল চার বান্ধবী।

অনু বলছিল, দশরথকে ওপরে শুতে বলে আজ ভাল করেছিস, শিবানী। আমার মন বলছে আজ চরম কিছু হবে।

শিবানী বলল, বাবা-মা অবশ্য এসব বিশ্বাস করছেন না। ওদের ধারণা, ছেলেটা বেড়ালগুলোকে দিয়ে কোন নষ্টামি করাতে পারেনি। শিবানী বলল, ছেলেটা বোধহয় ছোটখাটো কোন যাদুকর গোছের কিছু। পাড়ায় ঢুকতেই পেছনে পুলিশ লেগে গেছে দেখে বিরক্ত হয়ে দাদু আর রথীনকাকুকে একটু নাচিয়েছে। মা এটাও বলেছেন, বেড়ালদের এভাবে মানুষ খুন করে রক্ত-টক্ত খাওয়া পশুবৃত্তিরই একটা স্বাভাবিক দিক। ভামেরা যেমন বাচ্চা-টাচ্চা পেলে টেনে নিয়ে যায়, এরা তার বদলে সাইজে একটু ছোট হয়েও নজরটাকে উঁচু রেখেছে। এ সবের সাথে ছেলেটার কোন যোগ নেই।

শুভ্রা বলল, কাকিমার সাহস আছে বলতে হবে। সব কিছু জেনেও—

শিবানী বলল, জানলেও নিজে যাচাই না করে মা কিছু বিশ্বাস করেন না। এই যে দাদু মাকে লুকিয়ে এই দু'দিন এসব করেছেন জেনে মা দাদুকে অ্যায়েসা বকেছেন যে দাদু বোধহয় এক সপ্তাহ ঘরের বাইরে পা রাখতে পারবেন না।

শুভ্রা হি হি করে হেসে আবার বলল, তাহলে আমার দাদু যে কাল সারারাত দরজা-জানলায় নখের আঁচড়ের শব্দ শুনেছে সেটার খোঁজ করতে বেরোলে দাদুরও খারাপ কিছু হতে পারত?

শিবানী বলল, নিশ্চিত! কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে সোরগোল করতে চাননা মা। আমার নিজের ধারণা, বেড়ালদের ব্যাপারটায় গুরত্ব না দিলেও কোন একটা বিপদ আঁচ করে মা দাদুকে বাড়ির বাইরে যেতে দিতে চাইছেন না। মনোতোষদাদুও যখন এ ব্যাপারে কাঁপিয়েছে তারও কিছু হওয়া সম্ভব।

তবে দুপুরবেলা রথীনকাকুরা তো ও বাড়িতে একটা বেড়ালের টিকিও আবিষ্কার করতে পারেননি। গোটা এলাকার সমস্ত বেড়াল যেন রাতারাতি ভ্যানিশ্ হয়ে গেল। কি অদ্ভুত ব্যাপার, বল্‌তো?

অনু বলল, ছেলেটা যখন সম্মোহন জানে ও বেড়ালগুলোকে কোথাও লুকিয়ে রাখেনি তো? এই ধর মাটির নিচের কোন লুকনো ঘর টরে?—ওর জাদু ব্যবহার করে আর কি—

—থেমে গেল অনু। তিন বান্ধবী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অনু একটু ঘাবড়ে গিয়েই বলল, মানে, খুব কি অসম্ভব?

শিবানী বলল, অসম্ভব মানে! মিসিং বেড়াল সম্বন্ধে এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু, রথীনকাকাদের এতজনকে একসঙ্গে ও বোকা বানাল কি করে?

—সেটার দুটো কারণ হতে পারে। এক, বেড়ালদের অন্য কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে—ও বাড়িতে নয়। নইলে, ছেলেটা মাস্ হিপনোটিজমও জানে। সেটাই কায়দা করে কাজে লাগিয়ে ও পুলিশদের বিভ্রান্ত করেছে। ওই যে বলছিলি না, ঘরময় ময়লা জমা করে রাখা—ওটাই হয়ত রথীনকাকাদের নিরুৎসাহিত করে তোলার জন্য ইনটেনশনালি করে রেখেছে। যাতে বেশি কিছু ফাঁস না হয়ে যায় তার জন্য চেষ্টার নিশ্চয়ই ও কসুর করেনি। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল অনু। শ্বেতা গালে হাত দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ বলল, ছেলেটা যদি লুকানো কোন ঘরে এখন, এই মুহূর্তেই বেড়ালগুলোকে নিয়ে কোন খারাপ মতলবে এসে যায় তাহলে তো আমরা ধরতেও পারব না।

শিবানীর চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলল, তাই তো! চল্‌তো দেখি, ছেলেটাকে দেখা যায় কিনা!

সকলে মিলে আগের দিনের মত হুমড়ি খেয়ে পড়ল জানলার ওপর। কিন্তু নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বাড়িটাকেই ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। বেশ মেঘ

জমেছে আকাশে। নীচেও জমাট কুয়াশার আস্তর। একটামাত্র স্ট্রীট ল্যাম্পের আবছা আলোয় বাড়িটার একটা কোণই শুধু চোখে পড়ছে।

শুভ্রা মনোযোগ দিয়ে ল্যাম্পপোষ্টের দিকে তাকিয়েছিল। দুজন লোক সেটার নীচে ওভারকোট জাতীয় কিছু পরে দাঁড়িয়ে আছে।

শিবানী পাশ থেকে প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, রথীনকাকা লোক লাগিয়েছেন দেখছি। ভালই হল, আজ আর বাছাধনকে ট্যা ফোঁ করতে হবেনা!

শ্বেতা লোকগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। একজন পকেট থেকে লাইটার বার করে আরেকজনের সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে পরে নিজেরটা ধরাল। বোঝাই যাচ্ছে, এমন শীতের রাতে কনকনে উত্তুরে হাওয়ায় দাঁড়িয়ে একটা দুর্বোধ্য ব্যাপারের পেছনে ছোটার কোন প্রেরণা ওরা পাচ্ছে না।

খোলা আকাশের নীচে লোকগুলোর রাতজাগাটা কতখানি কষ্টকর হয়ে উঠবে ভাবতে গিয়ে অনু দেখল, লোকগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে তার থেকে কয়েক গজ তফাতে বাড়ির যে কোণটা দেখা যাচ্ছে সেখানে দুটো চারটে করে অসংখ্য আলোকবিন্দু জেগে উঠছে। আলোগুলো এত অল্প সময়ের ভেতর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে অবাক বিস্ময়ে অনুর মুখ থেকে কোন শব্দই বের হল না। ইশারায় সে ঘটনাটার দিকে শ্বেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

বেড়ালের দল জেগে উঠেছে। তারা আস্তে আস্তে ঘিরে ধরছে ল্যাম্পপোষ্টের নীচের মানুষদুটোকে। দ্রুত চিন্তা করতে শুরু করল শিবানী। মানুষ দুটোর সামনে কি ভয়ানক বিপদ ওরা কি তা বুঝতে পারছে?

বেড়ালগুলো লোকদুটোকে ঘিরে ওদের বৃত্তটা ছোট করে আনছে।

রথীনকাকা নিশ্চয়ই বিপদের গুরুত্ব সম্বন্ধে এদের আগে থাকতে

জানিয়ে রেখেছেন একথা আন্দাজ ক'রেও শিবানী প্রায় চীৎকার করে সকলকে বলল, টর্চগুলো! শিগ্‌গিরি।

চার চারটে পাঁচ সেলের টর্চের আলো যখন ল্যাম্পপোস্টটার কাছাকাছি জায়গায়টায় গিয়ে পড়ল তখন সেখানে যা দেখা গেল তাতে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল শিবানীদের।

মানুষ দুটোকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেছে বেড়ালের দলটা। দুটো প্রকান্ড বেড়াল লোকদুটোর টুটি কামড়ে ধরে ঝুলছে। প্রায় ছ'ফিট উচ্চতার মানুষ দুটোকে শরীরের সামান্য যতটুকু অংশ অনাবৃত ততটুকুর ওপরই যেন সমস্ত রাগ বেড়ালগুলোর।

একটা সময় লোকদুটো পাগলের মত গলার ওপর থেকে বেড়ালগুলোকে যেন উপড়ে তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলল।

শিবানীরা নির্বাক বিস্ময়ে দেখতে থাকল, বিরাট চেহারার মানুষগুলো প্রায় লাফাতে লাফাতে ওভারকোটের পকেটে রাখা আগ্নেয়াস্ত্রগুলো বার করে আনতেই বেড়ালগুলো এবার ওদের চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

টর্চের আলোয় এক অদ্ভুত ভয়াবহতা ক্রমশ পূর্ণতার দিকে এগোচ্ছে। হাঁটু মুড়ে মাটির ওপর বসে পড়েছে মানুষ দুটো। দুজনের হাতেই উঠে এসেছে দু'দুটো রিভলবার। বেড়ালের দল কিন্তু তাদের পিঠ বেয়েই ওঠানামা করছে। দুটো বেড়াল চরম বীরত্বের পরিচয় দিয়ে লোকগুলোর মাথায় চড়ে চুলগুলো আঁকড়ে ঘনঘন ডাকতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য বেড়ালগুলোও যোগ দিল সেই কোরাসে।

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পড়ছিল শিবানীরা। লোকগুলো রিভলবার হাতে নিয়েও গুলি করছে না কেন? শ্বেতা আর অনু ওদের টর্চের আলো

নামিয়ে আনল লোকগুলোর হাতের রিভলভারের ওপর। যন্ত্রগুলো ঠিকই আছে। এমনকি সেগুলো ধরে রাখা হাতগুলোকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, যদিও রিভলভার সমেত সেই দুটো হাতই মানুষ দুটোর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কিছুটা দূরত্বে ঘাসের ওপর নিথর হয়ে শুয়ে রয়েছে।

বিকট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল অনুর মুখ থেকে। টর্চের আলোয় আরও দেখা যাচ্ছে রক্তাক্ত হাত দুটোর বিভিন্ন জায়গায় মুখ গুঁজে রক্ত শুষে নিচ্ছে দুটো বেড়াল। টর্চের আলোয় তাদের রক্তাক্ত মুখ আর জ্বলন্ত চোখগুলোকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

লোকদুটোর দেহ ঠায় তেমনই হাঁটু ভাঁজ করা অবস্থায় মুর্তির মত নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে।

লোক দুটো যে মারা গেছে এই বোধটুকু যখন চার বান্ধবীকে মূক বিস্ময়ের চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে তুলেছে তখনই দেখা গেল ওদের দুজনের পিঠের দিকের পোষাক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে এককেটা বেড়ালের মাথা। বেড়ালেরা মানুষ দুটোর নাড়িভুঁড়ি মাংস চিরে ফেলে—এককথায় তাদের সমস্ত শরীর খুঁড়ে ফেলার এক নারকীয় খেলায় মেতে উঠেছে।

অনেকক্ষণ সহ্য করেছে শ্বেতারা। এবার সকলে একযোগে চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দিকের সমস্ত শব্দ থেমে গেল। থেমে গেল সমস্ত বেড়ালের হিংসুক ডাক।

উত্তুরে হাওয়ার তেজ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এমন সময় মাঠের কোণ ঘেঁষে আরেকটা আলো জেগে উঠল। শ্বেতারা দেখল ধীরে ধীরে দারুণ সন্তর্পণে আগের দুদিনের দেখা একটা গোলাকার লণ্ঠন হাতে বেড়ালগুলোর দিকে এগিয়ে আসছে বেড়াল বাড়ির রহস্যময় সেই ছেলেটি। বেড়ালরাও শিকারদের ছেড়ে ছেলেটির কাছে গিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে আরম্ভ করল।

পুলিশ দুজনের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ দুটোর দিকে একবারের জন্যও না তাকিয়ে বেড়ালদের গোটা দলটা নিয়ে ছেলেটা এগোতে শুরু করল। দোতলায় শিবানীদের তখন আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে পড়ার উপক্রম।

শ্বেতা বলল, ও...ও কোথায় আসছে, শিবানী?

অনু বলল, নির্ঘাৎ এখানে। আমরা ওদের সঁবকিছু দেখে ফেলেছি। ওরা এখানে আসবেই।

শুভ্রা বলল, সবাই তৈরী হয়ে নে। গোটাকতক বেড়ালের কাছে হেরে যাব! শিবানী, তুই যা। দশরথদাকে ডেকে তোল। আর হ্যাঁ, অনুকে সঙ্গে নিয়ে যা। শ্বেতা, তুই সব কটা জানলা বন্ধ করে দে।

শিবানী অনুকে নিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সেই সঙ্গে হাতের কাছের জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত করার কাজটা শুরু করল শ্বেতা। শুভ্রা এত ক্ষিপ্র যে তার সঙ্গে তাল মেলাতে শ্বেতাকে ঘরগুলোর ভেতর প্রায় দৌড়ে বেড়াতে হচ্ছিল। মাঝখানে ঘরের কোণের একটা জানলার কাছ থেকে নীচের দিকে তাকাতেই ছেলেটাকে আর একবার দেখতে পেল সে। খিড়কির দরজার বাইরে বাউন্ডারী ওয়ালের ওপর লণ্ঠনটা রেখে একদৃষ্টে দোতলার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ছেলেটা। শ্বেতা তাকাতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হল ওর। অবর্ণনীয় রীরংসার প্রকাশ তার দৃষ্টিতে। কিন্তু, শ্বেতা ওর চোখ ছেলেটার দিক থেকে ফেরাতে পারল না। খানিক দূরে কাজে ব্যস্ত শুভ্রা ধরতে পারল না শ্বেতার ভেতর কি পরিবর্তন আসছে।

একটা আলতো ধাক্কা মারতেই দশরথের ঘরের দরজাটা খুলে গেল। কুপকুপ করছে অন্ধকার ভেতরে। অনু ডাকল, দশরথদা, ও দশরথদা? প্রত্যুত্তরে ভেতর থেকে মৃদু বেড়ালের ডাক ভেসে এল। চমকে উঠে দরজার পাশে ঘরের আলোর সুইচটা টিপতেই দেখা গেল রক্তের স্রোতের ভেতর

যেন হাবুডুবু খাচ্ছে দশরথের প্রাণহীন দেহটা। তার গলার নলিটা কুৎসিতভাবে ছিঁড়ে নিয়েছে যে বেড়ালের দল তাদের দু'একটা মনোযোগ দিয়ে নিজেদের রক্তাক্ত থাবাগুলো চাটছে। পেছন দিককার জানলার কাঁচগুলো ভাঙা। বেড়ালগুলো সেখান দিয়েই ঘরের ভেতর এসেছে।

কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে এসে দশরথের ঘরের দরজাটা পেছন থেকে বন্ধ করে দিল অনু। নীরবে কাঁদছে শিবানী। বহুদিনের কাছের এক সম্পর্ক দশরথদার মৃত্যুর সাথে ছিঁড়ে গেল!

শিবানীর মানসিক অবস্থার ছবিটা অনুর কাছে পরিষ্কার হওয়ার আগেই করিডোরে একদিকে ছোট ছোট কয়েকখন্ড কালো ছায়া যেন একত্রিত হল। সাতটা কালো বেড়াল। হুবহু একই রকমের। করিডোরে তীব্র আলোর নীচে দুধসাদা মার্বেলের মেঝের ওপর কালো সর্পিল একটা রেখা তৈরী করে শিক্ষিত সৈনিকদের মত অনুদের দিকে এগোতে লাগল বেড়ালেরা।

দরজার বাইরে মুহুর্মুহু বেড়ালের ডাক হিমানীকে দরজা খুলতে বাধ্য করল। দরজার ঠিক বাইরে একদম তার দিকে মুখ করে বরফ সাদা একটা বেড়াল বসে, আর ঠিক তার পাশ থেকে আরো একসারি বেড়াল ঠিক যেন আক্রমণের অপেক্ষায়....।

এক পা পিছিয়ে এলেন হিমানী। জগদীশের সন্দেহকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি বলে তার অনুতাপ হল। কিন্তু, আর কিছু ভাববার অবসর তাকে দিলনা সামনের বেড়ালটা। হিমানীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সরাসরি। নখের নির্মম আঘাতে নাইটির একটা প্রান্ত ফড়ফড় করে ছিঁড়ে শঙ্খের মত উরু বেরিয়ে পড়ল। আর্তনাদ করে উঠলেন হিমানী। বাকি বেড়ালগুলোও ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাথরুমের ভেতর থেকে স্লিপিং স্যুট পরিহিত প্রকাশ এসে ঘরে ঢুকলেন।

ঘরে ঢুকেই প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেলেন প্রকাশ। সাত-আটটা বেড়াল হিমানীকে একেবারে কোনঠাসা করে ফেলেছে! দু'হাতে মুখ ঢেকে

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন হিমানী। চুলগুলো অবিন্যস্ত, কপালের ওপরেও কয়েক গুচ্ছ ছড়িয়ে আছে। ঘন ভ্রু'র নিচের সমুদ্রের মত গহন চোখগুলো আঙুলের ফাঁক দিয়ে আতঙ্কের প্রহর গুনছে। প্রকাশ দেখলেন, হিমানীর উরু চিরে রক্তের একটা ধারা নামছে। গভীর একটা রেখা, বিস্ময়সূচক চিহ্নের মত। একটা দুঃস্বপ্নের মত তিনি দেখলেন, বেড়ালের দল জিভ বার করে ঠোঁট চাটতে শুরু করেছে। মাথার ভেতর যেন একটা বিস্ফোরণ হয়ে গেল প্রকাশের। এক লাফে বিছানার ওপর রাখা মশারিটা তুলে নিলেন তিনি।

প্রকাশের আকস্মিক উপস্থিতি বেড়ালদের ভেতর একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। কয়েক মুহূর্তের জন্য হিমানীর দিক থেকে নজর ফিরিয়ে প্রকাশের দিকে তাকাতে বাধ্য হল তারা, আর এই সুযোগটাই কাজে লাগালেন প্রকাশ। মশারিটা খুলে নিয়ে জাল ফেলার ভঙ্গীতে ঘুরিয়ে ছুঁড়লেন বেড়ালগুলোর ওপর। বেড়ালগুলোও লাফ দেওয়ার মত ভুল করে বসল।

জালে বন্দী মাছের মত বেড়ালগুলো যখন খলবল করছে সেই মুহূর্তে প্রকাশ তাকালেন হিমানীর দিকে। হিমানী প্রায় দৌড়ে এসে প্রকাশকে টুক্ করে একটা চুমু খেয়ে খাটের ওপর থেকে ড্রেসিং গাউনটা তুলে কোমরবন্ধটা শক্ত করে বেঁধেই বললেন, এখন আমার পায়ের রক্ত-টক্ত নিয়ে আবার ভাবতে বোস না। এদের ব্যবস্থাটা করে চল দেখি ওপরে বাবা আর মেয়েগুলো কি করছে।

প্রকাশ বিদ্বেষপূর্ণ গলায় বললেন, তোমাকে যা করেছে তাতে এদের এখনই মেরে ফেলা উচিত।

বেড়ালগুলো শদন্তে নাইলনের মশারি ছিঁড়ে ফাঁক করে ফেলেছে দেখে হিমানী বললেন, ক্লোরোফর্মের একটা ছোট্ট শিশি আছে বাথরুমের তাকে। ওটা চট্ করে আনো তো।

প্রকাশ শিশিটা এনে হিমানীকে দিলেন। হিমানী ইঙ্গিতে প্রকাশকে বাইরে যেতে বলে দু'আঙুলে নাকটা টিপে শিশির ঢাকনা খুলে মশারির ওপর ক্লোরোফর্মটুকু উপুড় করে দিলেন।

ঘরের বাইরে আসার কিছুক্ষণ পরে আবার দরজা খুলে ভেতরে উঁকি মেরে দুজনে দেখলেন, নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে বেড়ালের দল।

একটা অর্ধগোলাকৃতি বেড়া রচনা করে বেড়ালগুলো এগিয়ে আসছিল অনু আর শিবানীর দিকে। সামান্যতম ভুলে দশরথের মত পরিণতি ঘটতে পারে এটা মাথায় রেখে পায়ে পায়ে নিচে নামার সিঁড়ির কাছাকাছি চলে এল ওরা। তেল চুকচুকে পাকান দুটো বেতের লাঠি এখানে শোয়ানো থাকে। অনুকে বেড়ালদের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলে বারান্দার একটা অন্ধকার কোণ হাতড়ে লাঠি দুটোকে তুলে নিল শিবানী।

বেড়ালগুলো আরো একটু এগিয়ে এসেছে। শিবানী একটা লাঠি অনুর হাতে তুলে দিল। অনু ওর শাড়িটা গাছকোমর করে পরে নিয়েছে। শিবানী ওড়নাটা চুড়িদারের ওপর শক্ত করে বেঁধে অনুকে, একটা ইশারা করল। এরপর, ডানদিক ঘেঁষে এগিয়ে গেল অনু আর শিবানী তার উল্টো দিকে।

অনুকেই প্রথম আক্রমণ করল বেড়ালরা। ঠিক সেই মুহূর্তেই শোনা গেল একতলার দরজা ভেঙে পড়ার আওয়াজ। অনু যখন লাঠিটা সপাটে সামনের বেড়ালটার লালাঝরা কুৎসিৎ মুখটার ওপর বসিয়ে দিচ্ছে তখনই তার আর শিবানীর মাঝখান দিয়ে বিদ্যুতের মতই বেড়ালগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অনুর পোষা আইরীশ সেটার—জলিয়ন।

অনু আর শিবানীর মোক্ষম মারে দুটো বেড়ালের মাথার ঘিলু বেরিয়ে গেছে। ধড়ফড় করতে করতে সেগুলো শান্ত হয়ে পড়ার আগেই আরো চারটে বেড়াল তাদের জায়গা নিয়ে নিয়েছে। শিবানী, অনুর বিস্মিত

চোখের সামনে তাদের গোটা দলটার ওপর নিজের কায়দায় প্রভুত্ব বিস্তার করা শুরু করল জলিয়ন। পরপর দুটো বেড়ালের ঘাঁড় কামড়ে ধরে মারাত্মক কয়েকটা ঝটকায় তাদের প্রাণ বের করে দিল জলিয়ন

অনু চীৎকার করে বলল, সাবাস জলিয়ন।

বেড়ালদের দলটা যেন কথাটার উত্তর দেবার জন্যই একসঙ্গে আক্রমণ করল জলিয়নকে। কোণঠাসা বেড়াল যে কি ভয়াবহ প্রাণী অনুরা সেটা দেখল। হাওয়ায় একেকটা অদ্ভুত লাফ দিয়ে জলিয়নকে আঘাত করতে আরম্ভ করল সবাই। অনু আর শিবানী আরো দুটো বেড়ালের ঘিলু বার করে দিল।

দু'চার মিনিটের ভেতরই বেড়ালদের মৃতদেহে বারান্দা ভরে উঠল। হিমানী আর প্রকাশ ছুটতে ছুটতে উঠে এলেন দোতলায়।

হিমানী যেন বারান্দায় ছড়িয়ে থাকা বেড়ালগুলোর মৃতদেহ দেখতেই পেলেন না। মেয়েকে সামনে পেয়ে প্রায় পাগলের মত বললেন, বাবা কোথায়? তোরা দাদুকে ডাকিসনি?

শ্বেতার পেলব সুন্দর দেহের নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছিল শুভ্রা। জানলার নীচে ছেলেটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর থেকেই ওর যেন কী হয়েছে। বন্ধ ঘরে শুভ্রার সঙ্গে ও পুরুষ প্রেমিকের মত ব্যবহার করতে চাইছে। শুভ্রা বিরক্তভাবে শ্বেতার অসভ্যতা সহ্য করছিল। অসম্ভব শালীনতাবোধ সম্পন্ন ভদ্র মেয়ের এভাবে অশ্লীল হয়ে ওঠার পেছনের কারণটাও দাঁতে দাঁত কামড়ে বোঝার চেষ্টা করছিল ও। বারবার তাকে বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধরছে শ্বেতা। চুমু খাচ্ছে। শরীরের নানান আপত্তিকর জায়গায় হাত বুলোচ্ছে। গেছো মেয়ে শুভ্রার মজাই লাগছিল। কিন্তু. হঠাৎই যখন শ্বেতা হুবহু কোন পশুর মত তার উরুতে দাঁত বসিয়ে দিল তখন আর সহ্য হলনা শুভ্রার। টেনে এক চড় কসিয়ে দিল শ্বেতার

গালে। আর সেই এক চড়েই মাটির ওপর ছিটকে পড়ল শ্বেতা। ঐ অবস্থাতেই গালে বারকয়েক হাত বুলিয়ে ফুঁপিয়ে উঠে বলল, তুই আমাকে মারলি কেন?

শুভ্রা বলল, বেশ করেছি। অসভ্যতা করছিলি, তাই মেরেছি।

শ্বেতা বলল, কি আজেবাজে বকছিস! আমি তো জানলা বন্ধ করছিলাম।

শুভ্রা বলল, ওটা তোর জানলা বন্ধ করা! তোকে জাদু করেছিল কেউ। নিশ্চয়ই নীচের ঐ ছেলেটা।

শ্বেতার যেন স্মরণে এল কোন্ ভয়াবহ পরিস্থিতির ভেতর তারা দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রায় চীৎকার করে বলল, অনু, শিবানী। ওরা ঠিক আছে তো?

শুভ্রা বলল, ওরা অনেকক্ষণ হল দশরথদাকে ডাকতে গেছে। এতটা সময় তো লাগার কথা না। অবশ্য, দাদুর ঘরে ঢুকলে আলাদা কথা। চল্, বরং বেরিয়ে একবার দেখি।

ছাদের ওপর থেকে বহুক্ষণ ছেলেটিকে নজরে রেখেছিলেন জগদীশ। বেড়ালের দল যখন বাড়ির একতলা আর দোতলায় মূর্তিমান আতঙ্কের মত ছড়িয়ে পড়ছে তখনও ধৈর্য্য থেকে বিচ্যুত হননি তিনি। একদৃষ্টে লক্ষ্য রাখছিলেন, কখন ছেলেটা ঠিক ছাদের নীচে এসে দাঁড়ায় এবং তিনি আস্ত একখানা টব তার মাথার ওপর ফেলতে পারেন।

পুরো আধঘন্টাও হয়নি, ছেলেটা তার আকাঙ্খিত জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। লণ্ঠনটা পাঁচিলের একেবারে কোনায় রেখে জগদীশের মনে হল, কোন একটা ব্যাপারে ছেলেটা সন্তুষ্ট হতে পারছে না। অবরুদ্ধ আক্রোশে

বুনো পশুর মত গজরাচ্ছে সে আর ছট্‌ফট্ করছে। আর দেরি করলেন না জগদীশ। ছেলেটার মাথা তাক্ করে বিশাল একটা ক্যাকটাসের টবকে শূন্যে ছেড়ে দিলেন তিনি।

১১

বেড়ালবাড়ির বাইরে বিরাট মাঠটায় সমবেত হয়েছেন গোটা সরকারবাগানের মানুষ। বেড়াল সংক্রান্ত অদ্ভুত ঘটনাবলীর শেষটুকু জানবার জন্য যে ধরণের উম্মাদনা দেখা যাচ্ছে তা এই এলাকাটার ষাট বছরের জীবনে একবারের জন্যও ঘটেনি। কিন্তু, ইন্‌সপেক্টর রথীনবাবু আর জগদীশমাস্টার হতাশ করেছেন সকলকে। বলছেন, একজন খুনী বেড়ালবাড়ির ভেতর এসে অনেকদিন লুকিয়েছিল। সে নাকি কেবল আনন্দের জন্য খুন করত। কেউ এসব কথা বিশ্বাস করছে, আবার কেউ করছে না, কেননা চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জনের জন্য পুলিশ তাদের কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছেনা।

বাড়িটার একতলার দ্বিতীয় ঘরটায় তখন স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জগদীশের পুরো পরিবার আর অনুদের কয়েকজন। রথীন তার পুলিশবাহিনীর হোমরাচোমরাদের সঙ্গে নিয়ে তাদের সঙ্গ দিচ্ছিলেন।

অনুদের চোখের সামনে ছ'বছর আগের একটা দৃশ্য নতুন করে ফুটে উঠেছে। সেই ঘর! সেই ইজিচেয়ার! সেই সিলিং থেকে সিল্কের দড়িতে ঝুলন্ত বেড়ালদের মৃতদেহ। কেবল ইজিচয়ারের ওপর এবার আর কোন স্ত্রীলোকের কঙ্কাল নেই। তার বদলে এবার সেখানে শুয়ে রয়েছে একজন মৃত পুরুষ। তার শরীরে খুব পুরনো একটা ড্রেসিং গাউন। পুরুষটির মাথার ওপরে ঝুরো মাটির গাদা। তার ওপরে একটা আস্ত ক্যাকটাস গাছ মুকুটের মত সোজা হয়ে বসে রয়েছে। শিবানীর মনে হল, ঠিক যেন মাথা থেকেই সোজা গজিয়ে উঠেছে ক্যাকটাস গাছটা।

জগদীশ ছেলেটির কোমরবন্ধনী থেকে একখণ্ড চিরকূট তুলে নিয়ে রথীনের হাতে দিলেন। সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে আবার জগদীশকে ফিরিয়ে দিয়ে রথীন বললেন, আপনিই পড়ুন মাস্টারমশাই।

জগদীশ স্তিমিতকণ্ঠে পড়লেন,—মাত্র ন'টা প্রাণের জন্য আমার ফিরে আসা। এবং আমার জন্মদাত্রীর মত আমিও ব্যর্থ। হয়ত এরপর আবারও চেষ্টা করতে হবে, তবেই এ পৃথিবী হবে আমাদের—বেড়ালদের।

—কিচ্ছু বুঝলাম না। রথীন অসহিষ্ণুভাবে বললেন।

—বেড়ালদের নাকি ন'টা জীবন। প্রকাশ বললেন, তবে কি বেড়ালরাজার ন'জনকে খুন করার দরকার হয়ে পড়েছিল?

সকলে শিউরে উঠে সিলিং-এর দিকে তাকালেন। সিল্কের দড়িতে ঝুলছে ছ'টি বেড়ালের মৃতদেহ। বুধুয়া থেকে শুরু করে দশরথ অবধি—প্রত্যেকের জন্য একটা করে বেড়াল। লক্ষ্য পূরণ হওয়ার চেয়ে মাত্র তিনটে কম। দীর্ঘঃশ্বাস পড়ল সকলের। সরকার বাগানে তখন তেজিয়াল রোদ উঠেছে।

নায়িকা সুদূর

চরম দেহবাদী নায়িকা, সমকামী প্রযোজিকা আর ফুলের মত নিষ্পাপ এক কিশোরীর সান্নিধ্যে এসে ভাল হতে শেখে ধুরন্ধর এক যুবক। পুজোর দিনগুলোতে প্রেমের ফুল ফোটে তার জীবনে। সে ভুলতে চায় তার বিশেষ এক বন্ধুর মাকে.........

হেমপ্রভার দেহটা হড়াস্ করে ইলেকট্রিক চুল্লীর আগুনে ঝাঁপ দিতেই সবার আগে যে কথাটা টিটোর মনে হল তা হল, এখনই কিছু খাওয়া দরকার।

গতরাতটা বিলকুল উপোসে গেছে টিটোর। অবশ্য তার জন্য দায়ী শচীন তেন্ডুলকার। রাত দুটো পর্যন্ত সে-ই সবাইকে ঘাড় ধরে বসিয়ে রাখল। আর পটলকা-- ও মানুষ বড় অদ্ভুত। কাউকেই বাড়ি যেতে বললেন না। অগত্যা মেসে ফিরতে ফিরতে প্রায় ভোর রাত। আসার সময় আবার পটলকার- বড় ছেলে গবাইদা কয়েকখানা নিষিদ্ধ বাজিও ধরিয়ে দিলেন টিটোদের হাতে। সেগুলো লুকিয়ে চুরিয়ে ফাটাতে ফাটাতেই শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। সেখান থেকে আর মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই মেস। ওড়িয়া ঠাকুর ভাগবত কাঁটায় কাঁটায় বারোটার পর শুয়ে পড়ে। খাওয়া-দাওয়া সারতে হলে বারোটার আগে সারো, এই তার সাফ কথা। মেসের মালিক ছেলেদুটো টিটোর চেয়ে মেরেকেটে বছর তিনেকের বড়। কিন্তু ঘোর ব্যবসা-বুদ্ধি দুজনের। ভাগবতের সঙ্গে ওদের কেউই ঝামেলায় যায়না। টিটো নিজেও অবশ্য সেটা চায় না। তাহলে মাসিক পাঁচশো যাট টাকার বিনিময়ে প্রায় অমৃততুল্য কিছু খাবারের জগৎ থেকে তাকে অনেকটা দূরে চলে যেতে হবে। হ্যাঁ, ভাগবত রাঁধে ভারি চমৎকার। আর তার থেকেই এতটা বেলা পর্যন্ত বঞ্চিত রয়েছে টিটো। হেমপ্রভার ওপর খুব রাগ হল তার।

যে ঘাটটা ধরে টিটোরা এইমাত্র গঙ্গার কাছাকাছি নেমে এসেছে তার বাঁ দিকটায় আলুথালু বেশে জনাকয়েক মধ্যবয়স্কা মহিলা দৃষ্টিকটুভাবে হুটোপাটি বাঁধিয়ে দিয়েছেন। টিটো ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখল। ঘাটের সেদিকটা থেকেই স্নান সেরে উঠে এসেছে রজত। টিটোকে মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে বলল, এরা কারা জানিস?

টিটো বলল, বলতে হবে না। প্রতি মুহূর্তেই বিজ্ঞাপন দিয়ে দিচ্ছে।

রজত বলল, ওপরের দিকটায় তাকিয়ে দ্যাখ্, পাঞ্জাবী ড্রাইভারগুলো কেমন ওদের দিকে তাকিয়ে আছে!

টিটো মুচকি হেসে সেদিকে না তাকিয়েই বলল, ও জানি। ...... ভাব বিনিময় চলছে।

গঙ্গার ফ্যাকাশে জল মাখতে মাখতে একটু অশালীন হয়ে উঠেছিল মেয়েগুলোর কথাবার্তা। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত-পায়ে একটু জল ছিটিয়ে টিটো বলল, চল্।

গামছায় ভেজা হাত-পা মুছে নিয়ে রজত ততক্ষণে তার জিনস্ আর লম্বা হাতা একখানা গেঞ্জি পরে নিয়েছে। প্যান্টের পকেট থেকে প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট বার করে ভেজা জামাকাপড় আর গামছাখানা তার ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে সে বলল, কাল রাত্রে বোধহয় তোর খাওয়া হয়নি, না রে?

নরম রোদে ধুয়ে যাওয়া চলমান একটা লঞ্চের দিকে তাকিয়ে টিটো বলে, আমাদের মেসের নিয়ম তো জানিস! তারপর আবার আজ ভোররাত থেকে এই কেস!

— তাহলে কষ্ট করে রাত-বিরেতে পটলকা-র বাড়ি যাস কেন? তোদের রিসেপশান রুমেই তো একটা টিভি আছে!

— ও বাবা, সে ভয়ানক ছবি! কখনও লম্বা, কখনও বেঁটে। তাছাড়া ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আমার পোষায় না।

— পটলকা-র তো বোধহয় স্যামসাং! — এর বড়টা, না?

— বড়, তবে স্যামসাং নয়। আমেরিকান। থমসন। তুই ওখানে আর যাসনা?

— নাঃ, বিশ্বকর্মা পুজোর পর আর যাইনি।

— ও, সেজন্যই দেখিসনি! এই তো মাসখানেক হল এক্সচেঞ্জ করে এটা নিয়ে এসেছে।

চক্ররেলের লাইনটা ক্রশ করার মুখে রজত আবার একদৌড়ে চায়ের দোকানগুলোর পেছনে সাময়িকভাবে হারিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পর যখন সে ফিরল তখন দেখা গেল তার ডান হাতে ধরা আছে একমুঠো গাঁজার পুরিয়া। টিটোর দিকে তাকিয়ে সে বলল, শ্মশ্মানে এলে এটা না হলে একদম চলে না, মাইরি।

টিটো বলল, একেবারে সক্কাল সক্কালই টানবি?

— তাতে কি! কচুরি গলিতে চ। ছোট হাজরির সঙ্গে দু'তিন গেলাস দুধ খেয়ে নিলেই হবে।

গলির ভেতর প্রথম কচুরীর দোকানটাতেই এসে ঢুকল দুই বন্ধু। তাদের প্রায় পেছন পেছনই জড়সড় ভঙ্গীতে উত্তর-চল্লিশের একজন মানুষও উপস্থিত হল সেখানে। টিটোরা যে টেবিলে এসে বসেছে তাতেই এসে বসল লোকটা। হেমপ্রভার এই মেজ ছেলেটিকে দু-চক্ষে দেখতে পারেনা টিটো। লোকটি জুলজুল করে তাদের দুজনকে দেখতে থাকে।

রজত বাঁ হাতের তেলোয় গাঁজার একটা পুরিয়ার ভার মুক্ত করে। তারপর মুখ না তুলেই বলে, কি হল, সাবুদা? এখানে কি মনে করে?

লোকটি চিন্তিতভাবে পুরিয়াটির দিকে একবার তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, তোমরা এভাবে চলে এলে যে!

টিটো তেরিয়া গলায় বলল, শ্মশানবন্ধুদের নিয়ে আপনাদের কোন চিন্তা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। সুতরাং —

লোকটি বলল, না, আসলে মার হঠাৎ এ'রকম একটা ব্যাপার..... তৈরি ছিলাম না তো ...... সিম্পটমটা দিনকয়েক আগেও বুঝতে পারলে...... মানে, একটু প্রস্তুতি —

রজত তেতো গলায় বলল, এতে এত বোঝাবুঝির কি আছে! সাত-আটটা ছেলে শেষরাত থেকে মড়া আগলে রেখেছে। আর এখন এতটা

বেলা হয়ে গেল, আপনাদের একটা মিনিমাম —

সাবুদা নামের লোকটি এবার তড়িঘড়ি বলল, বড়দা বিশুদের নিয়ে একটু আগেই ওদিকের গলিটায় ঢুকেছে। তোমাদের দায়িত্বটা ছিল আমার ওপর। তো, তোমরা যে ঐদিকের ঘাটে গিয়ে নেমেছ সেটা বুঝতে পারিনি।

টিটো রজতের দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচিয়ে বলল, তাহলে তো কিছুই বলার নেই। বলুন, কী করবেন —

সাবুদা রজতের হাতের কারুকাজ দেখতে দেখতে বলল, আমি অর্ডার দিয়ে পয়সা মিটিয়ে যাচ্ছি ...... ঐ দুধ-টুধেরও। তোমরা ম্যাটাডোরটার কাছে চলে এস।

রজত কোন উত্তর দিল না। তাদের একটু আগের কথোপকথন লোকটা পেছন থেকে শুনে ফেলেছে! আরো মনোযোগ দিয়ে সিগারেটে গাঁজা ভরে চলল সে। অগত্যা সাবুদা বিরক্তমুখে ক্যাশবাক্সের পেছন দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসা দোকান মালিকের হাতে কিছু টাকা দিয়ে খুচরোটা গুনে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুটো বড় গেলাস ভর্তি গরম দুধ আর ছটা করে কচুরী, আলুর তরকারি খেয়ে মিনিট পনেরর ভেতরই রাস্তায় নেমে এল দুই বন্ধু।

রজত টিটোর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে গাঁজা ভরা সিগারেটটা ধরিয়ে বলল, ভাগের মা কাকে বলে আজ বুঝলাম। একেবারে শ্মশানবন্ধু থেকে শুরু করে দিয়েছে।

টিটো বলল, এখন তো দেখি এসরেরই চল। হয়ত আমার মা-বাপ-ভাই-বোন নেই, তাই এমন দিন আমাকে দেখতে হয়নি।

রজত সিগারেটটায় একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, ওসব কিস্যুনা। এগুলো আসলে রক্তের ব্যাপার। কারো কারো মা এভাবেই মরে। তোর দিদা মারা যাবার সময় কি তোর মামাদের এমন নোংরামো করতে

দেখেছিস?

টিটো চিন্তিতভাবে বলল, বাবাদের দিকে তো কেউই আর নেই। জন্মাবধি ঐ মামাদেরই দেখে আসছি। তা'ও বারাসাতের বাগানবাড়িটায় চাকর-বাকর নিয়ে একলা দিদিমাই এতদিন ছিলেন। মামারা তো সকলেই বাইরে। বছরে দু'তিনবার এসে ফূর্তির এমন বান ডাকিয়ে দিতেন, যে মনে হত সিনেমা দেখছি। আর এখানে। মড়া মা'কে সামনে ফেলে রেখে সম্পত্তির হিসেব কষা — এগুলো মাইরি, সত্যিই শেখা হয়নি!

রজত ঘেন্নায় মুখখানাকে কুঁচকে বলল, মা'কে লুকিয়ে নিজেরা দিনের পর দিন ভাল ভাল খাবার খেত জানিস? আর বুড়ি পেত হাতে করা রুটি, একটু ডাল বা খানিকটা গুড়। এতগুলো বউ, তারাও তো মেয়েমানুষ, সবাই-ই বাচ্চা-কাচ্চার মা। কেউ এতটুকুও দয়া দেখায়নি। আমাদের লাগোয়া বাড়ি বলেই সবটা আমি পরিষ্কার দেখেছি।

টিটো হাঁটার গতি একটু কমিয়ে দিয়ে বলল , আজকে আমরা যাদের খারাপ মেয়ে বলে জানি কালের নিয়মে এরাওতো একদিন মা হয়ে যাবে। কিন্তু, স্বভাব কি তাতে পাল্টাবে! অসভ্য ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মা-বাপের কি তাদেরই মত অভিভাবকদের সঙ্গে এরা কেবল নোংরামোই করে যাবে। সাবুদাদের কেসটাও এরই একটা প্রমাণ।

বড় রাস্তায় উঠে আসতেই একটা বাঁকের কাছে দাঁড়ান একখানা লঝ্‌ঝড়ে ম্যাটাডোরের পাশে সাবুদাকে খুব দ্রুত কিছু একটা খেয়ে কাগজের একটা ঠোঙা ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখা গেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই রজতের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। বলাই বাহুল্য দৃষ্টি বিনিময়টা খুব সুখকর হলনা। সিগারেটটা মাটিতে ফেলে বাঁ পায়ের তলায় পিষে রজত বলল, শালারা সারাদিন এত খায়! .... এই সিচুয়েশনেও আড়াল করে ঠিক মেরে দিল। অথচ, আমাদের পাশে বসে খাবার হিম্মত নেই। যদি খরচা বেশি হয়ে যায়।

টিটো বলল, ছেড়ে দে, আর ভাল্লাগ্ছে না। আমাকে আবার ঘুরে বীনা সিনেমার কাছে আসতে হবে।

রজত বলল, এই ওয়ান ওয়েগুলোর ফ্যাঁকড়া যে কবে মিটবে! আচ্ছা, তোর তো পড়াশোনার ছুটি হয়ে গেছে। মামাবাড়ি ফিরে যাচ্ছিস না কেন ?

টিটো অসভ্যের মত হাসল। বলল, আমার ট্যুইশান বাড়িতে একটা পাগলী আছে। হাফ্-বৌ হয়ে গেছে বলতে পারিস। ওর জন্যই যেতে পারছি না।

রজত বলল, তুই তো খুব শয়তান। অ্যাদ্দিন বলিসনি কেন?

টিটো বলল, গোকুলে বাড়ছিল। বলার মত অবস্থা হয়নি বলেই বলিনি। আজই এটা তোকে বলার মত পোজিশনে এল।

রজত কোন উত্তর দেবার আগেই আরেকটা গলি থেকে এক দঙ্গল ছেলে বেড়িয়ে এল। ম্যাটাডোরটার কাছে গিয়ে তাদের বেশির ভাগই নানা কায়দায় ওপরে উঠে গেল। হেমপ্রভার অন্য তিন ছেলের দুজনও উঠল। বড় ছেলে গম্ভীর মুখে সাবু অর্থাৎ তার মেজ ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাটাডোরের সামনের দিকটায় উঠে গেল। ছেলেগুলোর ভেতর থেকে পান্ডাগোছের একজন টিটোদের বলল, কি রে, তোরা যাবি না?

রজত বলল, না বিশুদা। এখানে আমাদের একটা কাজ আছে। ঘন্টাখানেকের ব্যাপার। ভাবছি, এসেছি যখন সেরেই যাই।

বিশুদা নামের লোকটি বলল, যা ভাল বুঝিস। আমরা তাহলে এগোই।

টিটো রজতের দিকে একপলক তাকিয়ে ম্যাটাডোরে চাপা ছেলেগুলোর উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে দিল। গাড়িটা বাঁক ঘুরে এগোতেই রজতের দিকে তাকিয়ে সে বলল, এটা কি হল?

রজত বলল, মার্কাস স্কোয়ারে আজ আমার একটা ম্যাচ আছে। ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। তুই যখন বললি, বীনা সিনেমাব কাছে যাবি। তখন ....

টিটো বলল, তখন কি ! বিবেকানন্দ রোডের মোড়ের ওখানটায় নেমে গেলেই তো হত। তোর আমার দুজনের সুবিধা হত।

রজত বলল, হত। কিন্তু, সকালবেলার কলকাতাটা না .... মানে, পায়ে হেঁটে এ গলি ও গলি করে হেঁটে না গেলে কোন মজা নেই। ভাবলাম, তুই তো এসবই ভালবাসিস। তাই না হয় একটু দেরি ....

টিটো রজতের পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলল, আরিব্বাস। ফিলজফার হয়ে ওঠার ফার্স্ট স্টেজ মনে হচ্ছে! চল, আজ তোর কথাই না হয় রাখি।

মহিমা তার ডান হাতে পরা ছোট্ট সুন্দর সুইস হাতঘড়িটা দেখিয়ে টিটোকে বলল, কী ব্যাপার সাহেব! আজ যে একেবারে আধঘন্টা লেট!

টিটো চেয়ারটা বিরাট সেক্রেটারীয়েট টেবিল থেকে খানিকটা তফাতে সরিয়ে পা দুটো সামনের দিকে আরেকটু ছড়িয়ে মহিমাকে বলল, ভোরবেলাতেই একটা মড়া পোড়ালাম। তারপর মার্কাস স্কোয়ারে বন্ধুদের একটা ক্রিকেট ম্যাচের খানিকটা দেখেও আসতে হল। সব মিলিয়ে আধঘন্টাটাক দেরি। তোমার বোধহয় একটু অসুবিধে হয়ে গেল?

মহিমা বলল, যাঃ! অসুবিধের কী, আসলে তোমার একটুখানি দেরি হলেও আমার মনেহয় বোধহয় আর দেখা হবেনা।

টিটো মহিমার দিকে দেখল। ভোরবেলাতেই স্নান সেরে নিয়েছে মহিমা। নীলাভ সবুজ রঙের লতাপাতা আঁকা ভারি সুন্দর একটা চুড়িদার পরে রয়েছে ও। গাঢ় রঙের বৈপরীত্যের জন্যই তার টকটকে ফর্সা রঙ যেন আরো বেশি করে খুলেছে। দিঘির মত দুটো বড় চোখের কিয়দংশ ঢেকে ছেড়ে রাখা চুল নেমে গেছে। টিটোর দিক থেকে দেখলে হঠাৎ মনে

হবে কোন পাহাড়ি ঝর্ণার জলোচ্ছ্বাস বোধহয় সামনে বাঁধ পেয়ে দুরন্তভাবে ফুলে উঠেছে।

টিটো গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মাথা নিচু করল মহিমা। ডানহাতের হাইগ্রিপ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ছুঁচলোমুখো ডটপেনটা দিয়ে সামনে রাখা নোটবুকটার খোলা পাতায় বারবার 'টিটো' শব্দটা লিখতে থাকল।

স্থিরদৃষ্টিতে টিটো তার দিকে তাকিয়ে থাকলে মহিমা ভাষা হারিয়ে ফেলে। বুকজুড়ে সাইক্লোন হতে থাকে। টিটো না বুঝতে পারলেও এই মুহূর্তে ওর সেরকম অনুভূতিই হচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে করা ওর প্রশ্নটার কোন জবাব দেয়নি টিটো। তার বদলে ওর হোমওয়ার্কের খাতাখানা দেখে চলেছে। অগত্যা একটা কপট দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে পড়ায় মন দিল মহিমা।

এ বাড়িতে টিটোর অবাধ বিচরণ। সে যে মহিমার বর হতে চলেছে এ ব্যাপারটা এ বাড়ি ছাড়া অন্যান্য বহু লোকেরই জানা। এবং সম্ভবত তার ব্যবহারের আর আনুষঙ্গিক গুণের জন্য প্রায় সকলেরই সস্নেহ প্রশ্রয় সে পেয়ে থাকে। এমন কী মহিমার রাশভারী বাবারও। এটা মহিমার কাছেও আশ্চর্য লাগে। কোন কোন দিন তো তাকে পড়ানো শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই টিটোকে নিজের স্টাডিরুমে ডেকে নেন তার বাবা। সেখানে দুজনে মিলে ঘন্টার পর ঘন্টা পার করে দেন। সেখানে মহিমার তো দূরের কথা তার মায়েরও পা রাখার অনুমতি নেই।

গতমাসে একদিন খুব কায়দা করে একটা দরকারী বই খোঁজার অছিলায় ওদের দুজনের খুব কাছাকাছি থাকার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল মহিমার। কান খাড়া করে কিছুক্ষণ তাদের কথাবার্তা শুনে তার ধারণা হয়েছিল কোন বিখ্যাত কাগজে বাংলা ছোটগল্প আর উপন্যাসে ভূতেদের অথবা ভৌতিক চরিত্রের কোন ভূমিকা নিয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার বরাত পেয়েছেন বাবা। যার মালমশলার জোগান দিয়ে যাচ্ছে টিটো। 'অক্ষয়

বটোপাখ্যানম্', 'কান্না', 'মেডেল', 'মায়া', 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' — একটার পর একটা নাম বলে যাচ্ছিল টিটো যেন সে কোন মানুষ নয়, একটা কম্পিউটার। মহিমা দেখেছিল বাধ্য ছাত্রের মত ঝড়ের গতিতে নামগুলো ডায়েরিতে তুলে নিচ্ছেন বাবা। হাঁটুর বয়সী টিটোর সঙ্গে বাবার আলাপচারিতায় সামিল হতে পারছে না অনেকটা এই রাগেই র‍্যাক থেকে যেমন তেমন গোটাকতক বই নামিয়ে এনে ওদের কাছে সে বলে ফেলেছিল, তারাশঙ্কর আর বিভূতিভূষণের এই গল্পগুলো কিন্তু আমার পড়া!

ব্যস্! বাবার লেখা থেমে গিয়েছিল। দুজনেই এমন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল যেন সে পৃথিবীর কেউ নয়। এইমাত্র অন্য কোন গ্রহ থেকে নেমে এসেছে। মানে মানে সরে পড়েছিল মহিমা। সে ভেবেছিল, রসভঙ্গ করার জন্য বাবা হয়ত পরে তাকে বকবেন। কিন্তু বাবা তাকে কিছুই বলেননি। উল্টে তার মনে হয়েছিল সে যে এইসব দিক্‌পাল লেখকদের লেখা পড়ে ফেলেছে, বাবা তাতে খুশিই হয়েছেন। কিন্তু, ধন্দ একটা থেকেই গিয়েছিল। টিটো পড়াশোনায় ভাল ফল করে থাকতে পারে। কিন্তু, তার চেয়েও দশগুণ ভাল রেজাল্ট করা ছেলেরা এ বাড়িতে বাবার কাছে আসা যাওয়া করে। তাহলে কি টিটো এমন কিছু জানে যা অন্যদের পক্ষে জানা অতটা সহজ নয়। হয়ত তাই। কিন্তু, টিটো নিজে থেকে কখনও কিছু তাকে বলেনি। ঐ ঘটনার পর ও আট-দশবার এ বাড়িতে এসেছে। মহিমা ঠারে ঠোরে কিছু জিজ্ঞাসা করলেও জবাব দেয়নি। যেমন, আজই ও কেমন চুপ করে গেল।

জানলার বাইরে কড়া রোদের খানিকটা গলিটা ভাসিয়ে দিচ্ছে। ছাদে ছাড়া এর বেশি রোদের সঙ্গে ঘরোয়া পরিচয় নেই মহিমাদের। কলকাতার গলিঘুঁজির মধ্যে যে রকম সেকেলে সব বনেদী বাড়ি থাকে তাদেরটাও তারই একটা। এখানে বড় বড় ঘর আছে, কিন্তু একফালি বাগানও নেই। গেটের দিক থেকে দেখলে কেউ হয়ত ভাবতেও পারবে না ভেতরে এতখানি জায়গা আছে। সেদিক দিয়ে টিটোদের বারাসাতের বাগানবাড়িটা স্বর্গতুল্য। কতখানি জায়গা! খোলা আকাশ, বাগান, পুকুর। টিটোর বউ হয়ে ঐ বাড়িটাতেই উঠতে চায় মহিমা। মাত্র একবারই তার

হবে কোন পাহাড়ি ঝর্ণার জলোচ্ছ্বাস বোধহয় সামনে বাঁধ পেয়ে দুরন্তভাবে ফুলে উঠেছে।

টিটো গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মাথা নিচু করল মহিমা। ডানহাতের হাইগ্রিপ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ছুঁচলোমুখো ডটপেনটা দিয়ে সামনে রাখা নোটবুকটার খোলা পাতায় বারবার 'টিটো' শব্দটা লিখতে থাকল।

স্থিরদৃষ্টিতে টিটো তার দিকে তাকিয়ে থাকলে মহিমা ভাষা হারিয়ে ফেলে। বুকজুড়ে সাইক্লোন হতে থাকে। টিটো না বুঝতে পারলেও এই মুহূর্তে ওর সেরকম অনুভূতিই হচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে করা ওর প্রশ্নটার কোন জবাব দেয়নি টিটো। তার বদলে ওর হোমওয়ার্কের খাতাখানা দেখে চলেছে। অগত্যা একটা কপট দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে পড়ায় মন দিল মহিমা।

এ বাড়িতে টিটোর অবাধ বিচরণ। সে যে মহিমার বর হতে চলেছে এ ব্যাপারটা এ বাড়ি ছাড়া অন্যান্য বহু লোকেরই জানা। এবং সম্ভবত তার ব্যবহারের আর আনুষঙ্গিক গুণের জন্য প্রায় সকলেরই সস্নেহ প্রশ্রয় সে পেয়ে থাকে। এমন কী মহিমার রাশভারী বাবারও। এটা মহিমার কাছেও আশ্চর্য লাগে। কোন কোন দিন তো তাকে পড়ানো শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই টিটোকে নিজের স্টাডিরুমে ডেকে নেন তার বাবা। সেখানে দুজনে মিলে ঘন্টার পর ঘন্টা পার করে দেন। সেখানে মহিমার তো দূরের কথা তার মায়েরও পা রাখার অনুমতি নেই।

গতমাসে একদিন খুব কায়দা করে একটা দরকারী বই খোঁজার অছিলায় ওদের দুজনের খুব কাছাকাছি থাকার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল মহিমার। কান খাড়া করে কিছুক্ষণ তাদের কথাবার্তা শুনে তার ধারণা হয়েছিল কোন বিখ্যাত কাগজে বাংলা ছোটগল্প আর উপন্যাসে ভূতেদের অথবা ভৌতিক চরিত্রের কোন ভূমিকা নিয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার বরাত পেয়েছেন বাবা। যার মালমশলার জোগান দিয়ে যাচ্ছে টিটো। 'অক্ষয়

বটোপাখ্যানম্', 'কান্না', 'মেডেল', 'মায়া', 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' — একটার পর একটা নাম বলে যাচ্ছিল টিটো যেন সে কোন মানুষ নয়, একটা কম্পিউটার। মহিমা দেখেছিল বাধ্য ছাত্রের মত ঝড়ের গতিতে নামগুলো ডায়েরিতে তুলে নিচ্ছেন বাবা। হাঁটুর বয়সী টিটোর সঙ্গে বাবার আলাপচারিতায় সামিল হতে পারছে না অনেকটা এই রাগেই র‍্যাক থেকে যেমন তেমন গোটাকতক বই নামিয়ে এনে ওদের কাছে সে বলে ফেলেছিল, তারাশঙ্কর আর বিভূতিভূষণের এই গল্পগুলো কিন্তু আমার পড়া!

ব্যস্! বাবার লেখা থেমে গিয়েছিল। দুজনেই এমন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল যেন সে পৃথিবীর কেউ নয়। এইমাত্র অন্য কোন গ্রহ থেকে নেমে এসেছে। মানে মানে সরে পড়েছিল মহিমা। সে ভেবেছিল, রসভঙ্গ করার জন্য বাবা হয়ত পরে তাকে বকবেন। কিন্তু বাবা তাকে কিছুই বলেননি। উল্টে তার মনে হয়েছিল সে যে এইসব দিক্‌পাল লেখকদের লেখা পড়ে ফেলেছে, বাবা তাতে খুশিই হয়েছেন। কিন্তু, ধন্দ একটা থেকেই গিয়েছিল। টিটো পড়াশোনায় ভাল ফল করে থাকতে পারে। কিন্তু, তার চেয়েও দশগুণ ভাল রেজাল্ট করা ছেলেরা এ বাড়িতে বাবার কাছে আসা যাওয়া করে। তাহলে কি টিটো এমন কিছু জানে যা অন্যাদের পক্ষে জানা অতটা সহজ নয়। হয়ত তাই। কিন্তু, টিটো নিজে থেকে কখনও কিছু তাকে বলেনি। ঐ ঘটনার পর ও আট-দশবার এ বাড়িতে এসেছে। মহিমা ঠারে ঠোরে কিছু জিজ্ঞাসা করলেও জবাব দেয়নি। যেমন, আজই ও কেমন চুপ করে গেল।

জানলার বাইরে কড়া রোদের খানিকটা গলিটা ভাসিয়ে দিচ্ছে। ছাদে ছাড়া এর বেশি রোদের সঙ্গে ঘরোয়া পরিচয় নেই মহিমাদের। কলকাতার গলিঘুঁজির মধ্যে যে রকম সেকেলে সব বনেদী বাড়ি থাকে তাদেরটাও তারই একটা। এখানে বড় বড় ঘর আছে, কিন্তু একফালি বাগানও নেই। গেটের দিক থেকে দেখলে কেউ হয়ত ভাবতেও পারবে না ভেতরে এতখানি জায়গা আছে। সেদিক দিয়ে টিটোদের বারাসাতের বাগানবাড়িটা স্বর্গতুল্য। কতখানি জায়গা! খোলা আকাশ, বাগান, পুকুর। টিটোর বউ হয়ে ঐ বাড়িটাতেই উঠতে চায় মহিমা। মাত্র একবারই তার

ওখানে যাবার সুযোগ হয়েছে। গত শীতে পিকনিক করার জন্য মা, মাসিরা যখন উপযুক্ত 'স্পট' খুঁজে পাচ্ছিলেন না তখন হাতের লুকোনো তাসের মত বাড়িটার সন্ধান দিয়েছিল টিটো। ছোটোমাসি একটু সরল প্রকৃতির। টিটোর গাল টিপে দিয়ে বলেছিলেন, আহা! সোনার চাঁদ জামাই তো এইসব খোঁজাখুঁজি থেকেই হয়। ওটা কি গোপনে প্রেমিকার সঙ্গে ....

মা সঙ্গে সঙ্গে ছোটমাসিকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আঃ, অঞ্জু! তুই ভীষণ ফাজিল। না গো, টিটো, আমাদের সত্যিই এবার একটু না বেরোলেই নয়। সারা বছরই এই হাতিবাগান আর ধর্মতলা করে যাওয়া অসহ্য হয়ে উঠেছে। তুমি চটপট একটা বন্দোবস্ত করে ফেল। আগামী রবিবারেই ....

তারই মাসদুয়েক আগে ওদের সম্পর্কটার কথা মা জেনেছিলেন। টিটো নিজেই ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ীকে ডেকে ঠান্ডা-মধুর গলায় সব জানিয়েছিল। ভেতরে ভেতরে সাংঘাতিক রকমের সিঁটিয়ে গিয়েছিল মহিমা। তার তখন সবেমাত্র ইলেভেন। আর এখনই কিনা একেবারে বিয়ের প্রস্তাব! অথচ, তাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে পরীক্ষায় পাশ করে গিয়েছিল টিটো। অবশ্য তার অনেকগুলো কারণ আজ মহিমা জেনে ফেলেছে।

খাতা দেখা শেষ করে সেটা একপাশে সরিয়ে রেখে টিটো বলল, সামনে যখন পরীক্ষা তখন একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো একটু কষ্ট করে দূরে রেখো। আর হ্যাঁ, ইয়ার এন্ডিং- এর এই সময়টা আমার কাছে এবার ভাইটাল। সম্ভবত এয়ারপোর্টের কাছাকছি কোন একটা স্কুলে জয়েন করব। তবে হয়ে যাবে। আর এর ঠিক পরের পদক্ষেপ কি হতে পারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। স......অ......অ......ব যৌথ। কেবল তোমার আর আমার। অতএব, রেজাল্ট যেন ভাল হয়। কেননা, যতই ভাল কর আমার সঙ্গে থাকার সময় তার চেয়েও ভাল হবে।

চেয়ারটা সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হেঁটে গেল টিটো। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, কাকিমাকে বোল, আজ আর কিছু খাবনা। এখন আমাকে রোজই একবার করে আসতে হবে। নইলে পুরো পুজোটা তুমি ফাঁকি দেবে। টিভি, সিনেমা, গল্পের বই আর পরচর্চা একদম বাদ। কেবল যোগব্যায়াম আর পড়াশোনা এই তোমার রুটিন।

মহিমা গোঁয়ারের মত বলল, এখনও বর হওনি মনে রেখো। অত চোটপাট করলে ডিসিশান চেঞ্জ করে ফেলব কিন্তু........

টিটো সিরিয়াসভাবে বলল, ফুঃ! কিস্যু আসে যায়না। রজতের মাসতুতো বোন কলি ওয়েটিং লিস্টে সবার আগে আছে। আমি জানি, একবার ওর কথা ভাবছি বললেই ও আমার জন্য মনুমেন্টের ওপর থেকে লাফ দিতে পারে — -

মহিমার কথা থেমে গেল। মুহূর্তের ভেতর তার মুখে বিস্ময়কর রকমের পরিবর্তন এসে গেছে। টিটোর মধ্যে অদ্ভুত এক আশঙ্কা পাক খেয়ে গেল। টেবিলের ওপর মাথা নামিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছে মেয়েটা! টিটো কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রাখার চেষ্টা করতেই জলভরা চোখ নিয়ে অন্ধের মত কনুই চালাল মহিমা। বেকায়দায় সেটা সরাসরি এসে লাগল টিটোর তলপেটে। দারুণ যন্ত্রনা হচ্ছে এমন একটা মুখভঙ্গী করে মহিমার পাশের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারটায় আবারও ধপ্ করে বসে পড়ল টিটো।

মহিমা কান্না থামিয়ে প্রায় একলাফে টিটোর বুকের ওপর গিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। দারুণ বিব্রত হয়ে টিটো বলল, আরে! কি করছ? দরজা খোলা আছে যে —

আবারও ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মহিমা। বলল, তুমি ঐ মেয়েটার কথা বললে বলেই তো তোমাকে মেরে দিলাম। খুব লেগেছে, না গো?

টিটো দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে মাংসপেশীতে সামান্য ঢেউ তুলে বলল, পিঁপড়ে হাতিকে মারতে এলে যতটুকু লাগে ঠিক ততটুকুই। আর কলি বলে যে মেয়েটার কথা বলছিলাম সে আসলে রজতের থেকে তেইশ বছরের বড়। তিন ছেলেমেয়ের মা। বড় ছেলেটা তো এখন বিদ্যাসাগর কলেজের থার্ড ইয়ারে —

মহিমা টিটোর পিঠে গোটাকতক কিল বসিয়ে দিয়ে বলল, বাব্বাঃ। তুমি যে কি করে এত তাড়াতাড়ি এতগুলো মিথ্যে কথা বলতে পারো?

— দাঁড়াও। এখনও শেষ হয়নি। কলিদি আমাদের সঙ্গে প্রায় বন্ধুদের মত মিশলেও আমাদের যখন তখন তুলে ছুঁড়ে দিতে পারে। টিটো বলল।

— মানে!?

— মানে, কলিদির ওজন গত মাস পর্যন্তও ছিল পাক্কা একশ কিলো। একটুও এদিক ওদিক নেই।

— বলো কি? মহিমা একেবারে থ' হয়ে যায়।

টিটো ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ইয়েস, মিস। ..... এবার ফাইন্যালি যাচ্ছি। আমার কথাগুলো কিন্তু একটু মেনে চলতে হবে।

তার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলার সাহস পেল না মহিমা।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল টিটো। পাল্লাটা সামান্য খুলে একটুখানি উঁকি দিয়ে তার দিকে আরেকবার উৎসুকভাবে তাকিয়েই পেছিয়ে এল মহিমা।

গলির ঠিক মুখটাতেই এসে দাঁড়িয়েছে তার বাবা।

রজত কুন্ডুদের বাড়িটা দোতলা। একটা বাদে সবই ছোট ছোট পায়রার খোপের মত ঘর। বাঙালী-অবাঙালী পরিবারগুলো গাদাগাদি করে সেখানে থাকে। বাড়িখানা একসময় বাংলাদেশের কোন এক

জমিদারের সম্পত্তি ছিল। কালক্রমে ভাড়াটেরাই যে যার অংশ কিনে নিয়ে অথবা চেপে বসে থেকে মালিক বনে গেছে। রজতরাও তাদেরই মত।

এ বাড়িটায় যারা থাকে তারা কেউই গরিব নয়, বরং এখনকার বিচাবে প্রত্যেকটা পরিবারকেই সচ্ছল উচ্চমধ্যবিত্ত পর্যায়ের বলা যায়। কিন্তু কলকাতার এমনই মোহ যে বহুবিধ অসুবিধে সত্ত্বেও কেউই এ বাড়ি ছাড়তে চায় না। আরো একটা পরোক্ষ কারণ এখানকার ধুলো, ইঁট ধরে স্কোয়ার ফীট পর্যন্ত অগ্নিমূল্য। সুতরাং এখান থেকে নগদ নিয়ে সেলাম ঠুকে গেলে দুটো ঘরের টাকায় শহরের শেষদিকে দু'খানা বড়সড় আকারের ফ্ল্যাটকিনে ফেলাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে জন্যই রজতদের মত বুদ্ধিমানেদের অনেকেই এখনও ধৈর্য্য ধরে বসে আছে।

রজতদের ঘরখানা দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ঠিক পাশে। এ বাড়ির বিচারে ওদের দরজায় উন্নত ধরণের একটা বেল লাগানো আছে। টিটো সেটা আলতোভাবে একবার টিপে একপাশে সরে দাঁড়াল। দোতলা থেকে হুড়মুড়িয়ে এক কালোয়ার পরিবার নেমে আসছে। বুড়ো থেকে কচি অব্দি সকলেরই পোশাক আষাকের বাহার দেখলেই বোঝা যায় প্রাক্ পূজা ভ্রমণে চললেন সবাই। এদের যে আজই যাওয়ার কথা সেটা কয়েকদিন আগেই রজত বলেছিল। ষষ্ঠীর দিনই সকলে আবার ফিরে আসবে। লটবহরগুলো নামতে দেখে আরেকটা কথা মনে হল টিটোর। এ বাড়িটায় এই মুহূর্তে রজতরা ছাড়া আর কেউই রইল না। বাকি চারটে পরিবারের সকলেই আগে দেশ-গাঁয়ে নিজেদের আপন জায়গায় ফিরে গেছে। এটা ওদের বরাবরের অভ্যেস। সেজন্য মাথা ঘামাল না টিটো। বরং বরাবরের মত সরব বাড়িটাকে তার থমথমে ধরনের পুরনো এক প্রতীকচিহ্ন বলে মনে হল।

রজতদের পরিবারে রজত আর তার মা ছাড়া কেউ নেই। রজতের বাবা কয়েক বছর আগেই গত হয়েছেন। অল্প কয়েকমাসের ব্যবধানে দু'দুটো স্ট্রোকের ধাক্কা সামলাতে পারেননি। রজতের মা রজতের বাবার তুলনায় অনেকই ছোট। কোন একটা গোলমেলে পরিস্থিতিতে বিয়েটা

হয়েছিল। কানাঘুঁষোয় অনেক কথা শুনেছে টিটো। রজত হয়েছিল বিয়ের ঠিক পরের বছরটাতেই। ওর মার বয়স তখন মাত্র পনের কি ষোল। আর আজ, এতগুলো বছর পরেও প্রায় চল্লিশের কোঠায় এসেও রীতিমতো সুন্দরী উনি। রাস্তায় বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে অনেক লোকেরই তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরতে চায়না। এমন ঘটনা টিটো দেখে দেখে অভ্যস্ত। রজতও এসব জানে। আশ্চর্যের ব্যাপার, সে যেন উপভোগ করে সবকিছু।

বেলটায় হাত দিয়ে আরো একবার টিপতে গিয়ে কি ভেবে দরজার পাল্লায় একটু ঠেলা দিল টিটো। দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কোন মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কে?

— আমি টিটো, কাকিমা। রজত নেই?

— না, ও কাঁকিনাড়ায় কলিদের ওখানে গেছে। শনিবার ফিরবে। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বোস। আমি স্নান সেরে আসছি।

দরজাটা বন্ধ করে প্রায় গাদাগাদি করে রাখা একখানা সোফার ওপর এলিয়ে পড়ল টিটো। এ ঘরগুলো এমন ঠান্ডা যে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়।

ভেতরে তিন নম্বর এবং একমাত্র বড় ঘরখানার লাগোয়া একফালি অংশে পার্টিশান দিয়ে চমৎকার একটা বাথরুম বানিয়ে নিয়েছে রজতরা। কয়েকবার, কাকিমা না থাকলে সেখানে স্নানও করেছে টিটো। কতরকমের সাবান, শ্যাম্পু আর ম্যাসাজ অয়েল যে সেখানে আছে ভাবলে অবাক লাগে।

বোধকরি ঘুমিয়েই পড়েছিল টিটো। ঘুম ভাঙল আলতো এক আঙুলের ছোঁয়ায়। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল ও। আর দাঁড়াতেই নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল।

তার শরীরের মাত্র কয়েক ইঞ্চি ব্যবধানে এসে দাঁড়িয়েছেন রজতের মা। শঙ্খশুভ্র দেহে কেবলমাত্র ধবধবে একটা তোয়ালে প্যাঁচানো। উরুর

খানিকটা ওপর পর্যন্তই কেবল ঢাকা পড়েছে তাতে। মাখনের মত ত্বকের ওপর ফোঁটা ফোঁটা জল জমে আছে। সমস্ত অবয়ব থেকে তাজা লেবুর গন্ধ ভেসে আসছে। ঘন কোঁকড়ানো চুলগুলো পিঠ ছাপিয়ে নেমে অবাধ্যের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চোখ ঝলসে গেল টিটোর। সে মুখ নামিয়ে নিল।

অবিকল কোন বাচ্চা মেয়ের মত কোমরে একটা হাত রেখে আরেক হাতে তার থুতনি ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে মহিলা বললেন, কি হল টিটো?

টিটো কোনমতে বলল, আমি বরং যাই, কাকিমা।

ওমা, কেন! আমি টাওয়েল পরে আছি বলে? ভদ্রমহিলা তার নগ্ন একখানা পা টিটোর ডানদিকের কাউচের ওপর তুলে দিলেন। একদম কোনঠাসা হয়ে পড়ল টিটো। তারপর একখানা হাত ধরে ভেতরে শোবার ঘরে নিয়ে এলেন কাকিমা। খাটের ওপর ফিনফিনে পাতলা অথচ দামি কাপড়ের একটা নাইটি তুলে নিয়ে তাকে বসতে বলে আবার ভেতরে কোথাও চলে গেলেন। উঁচু খাটটায় খুব পুরু নরম গদি পাতা। তাতে বসেই পাশের ঘর থেকে ফ্রিজ খোলার শব্দ পেল টিটো। দেয়ালঘড়িতে সময় দেখল। মাত্র কয়েক মিনিট কেটেছে!

একটু পরেই ঘরে এসে ঢুকলেন কাকিমা। বাঁ হাতে একটা জিনের বোতল। ডানহাতে একটা ট্রে। কাজুবাদাম আর ফালি ফালি করে কাটা আপেল রয়েছে তাতে। টিটোর দিকে পেছন করে বিছানার উল্টোদিকের টিপয়ের ওপর জিনিষগুলো নামিয়ে রেখে দুটো কুশন পাশাপাশি জুড়ে তার কাছে ঠেলে দিলেন মহিলা। টিটোর শরীরের ভেতরে লুকোনো আগ্নেগিরির মুখখানা যেন একটু একটু করে খুলছে। নাইটির ভেতর দিয়ে কাকিমার দেহাবয়বের পেছন দিকটা অপ্রাকৃতভাবে ধরা দিচ্ছে।

কী অপূর্ব সুন্দর কোমর। যেন মুঠিতে ধরা যায়। চড়াইয়ে স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশি দীর্ঘায়িত। পিঠ, ঘাড় হয়ে কোমলভাবে

এগিয়েছে। তেমনই নীচে তানপুরার ভঙ্গীতে কিছুটা ভারি হয়ে সাদা পাথরের মসৃন কোন থামের মতন নেমে গিয়েছে। কোন মহিলার শরীরে ঈষৎ নড়াচড়াও যে এত বার্তাবহ হতে পারে এই প্রথম জানল টিটো। নাইটিটাও প্রয়োজনের তুলনায় বাড়াবাড়ি রকবের হ্রস্ব। কোমরবন্ধনীটা এহেন পোশাকের ওপর দেখে সকলেরই হাসি আসা উচিত। কিন্তু, সেটাও এলনা টিটোর। তার মন বলছে, এখনই এখান থেকে বিদায় না নিলে সমূহ বিপদ। কিন্তু, কাজের ক্ষেত্রে দেখা গেল ঘরের দু-দুটো পাখা একসঙ্গে চালিয়ে দিয়ে তাকে আরো গুছিয়ে বসতে হয়েছে।

ঘরে জানলাগুলো বন্ধ। কিন্তু, বাইরে থেকে টপাত্ টপাত্ করে শব্দ শুরু হয়েছে। বৃষ্টি এল যেন অসময়কে চিহ্নিত করে।

টিটোর দিকে ফিরে জিনের বোতলটার ছিপি খুলে কাকিমা বললেন, নাও। দুটো পাতিয়ালা বানাও তো। কুইক্ —

টিটো অবরুদ্ধ গলায় বলল, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কাকিমা। রজত ......

— আঃ! আমার নাম রঞ্জা। কাকিমা কাকিমা করবে না তো!

— কিন্তু ....

— বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে শুনতে পাচ্ছো?

টিটোর পুরুষালি শরীরটা সম্পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে লেহন করতে করতে একদম কাছে এসে বাঁহাতে বোতলটা নিয়ে ডানহাতে তার চুলের পেছনটা মুঠোয় ধরে বললেন, আমাকে দেখে দারুণ রিয়্যাকশান হচ্ছে তোমার। ফাইন। না হলেই বুঝতাম তুমি অস্বাভাবিক। আরেকটু ব্যাটাছেলে হওনা বাবা। তাড়াতাড়ি পেগগুলো বানাও।

অপমানে কান দুটো লাল হয়ে উঠল টিটোর। খাট থেকে নেমে

কুশনে বসে রঞ্জার হাত থেকে বোতলটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চমৎকারভাবে দুটো পেগ বানিয়ে ফেলল ও। রঞ্জা মুচকি হেসে ভেতরে চলে গেলেন। ফিরলেন একটা ছোট্ট আইস বাকেট নিয়ে। আলগোছে দু'টুকরো বরফ দুটো গেলাসে ফেলে একটা তুলে নিয়ে টিটোর শরীর ঘেঁষে বসে পড়লেন। টিটোর আগ্নেয়গিরিটা আবার ফুঁসে উঠল।

রঞ্জা তার গেলাসে গেলাস ছুঁয়ে বললেন, চীয়ার্স। তারপর এক চুমুকে তরল আগুনটুকু এক ঢোকে আত্মসাৎ করলেন। টিটোও যন্ত্রের মত অনুসরণ করল তাকে। চারটে বড় পেগের পর আধো ঘুম আধো জাগরণের ভেতর টিটো টের পেল তার সাহস বেড়ে যাচ্ছে।

কাকিমা অথবা রঞ্জা তার পিঠে আর কানের নীচে আলতো চুমু খাচ্ছিলেন। টাইট জিনসের প্যান্ট আর গেঞ্জিটা এবার টিটোর কাছেও অসহয়নীয় মনে হল। মহিলা ততক্ষণে ওর প্যান্টের জিপারটা টেনে নামিয়ে দিয়েছেন। বাকি কাজটুকু নির্দ্বিধায় সেরে ফেলল টিটো। পঞ্চম পেগটা ও শেষ করল সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়। রঞ্জা নিজেও বোধহয় একটু অবাক হয়ে গেছিলেন। টিটো বুক চিতিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রঞ্জা কুহকিনীর হাসি হাসলেন। গালে টোল পড়ল। কিন্তু টিটোর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিল মহিলা যেন একটু ভয় পাচ্ছেন। সে ভয় স্বেচ্ছাকৃত আত্মসমপর্ণের।

কুশনের ওপর থেকে তার শরীরটা বলিষ্ঠ দু'হাতে তুলে নিল টিটো। বুনো একটা টানে কোমরবন্ধটা খুলে নিল। তার চোখের সামনে যেন ভরাট প্রকৃতির হাতছানি। রঞ্জার চোখদুটো বোজা। টিটো তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, কাকিমা!

রঞ্জা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটখানা কামড়ে বললেন, আমার ভেতর আয় ....আয় .... আয়।

নাইটিটা ঝপ্ করে মেঝেয় খুলে পড়ল আর ঠিক তার পরেই বিছানার ওপর টিটোকে পেড়ে ফেলে ওর ওপর বাঘিনীর মত লাফিয়ে পড়লেন রঞ্জা। টিটোর ঠোঁটের ভেতর থেকে ওর শৈশব পর্যন্ত যেন শুষে নিতে থাকলেন। টিটোও ঠিকঠাক খেলা ফিরিয়ে দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর

টিটোকে বসিয়ে তার কোমরের পাশ দিয়ে নিজের দু'পা চালিয়ে দিয়ে ওকে কবরের ওপরের ক্রশ চিহ্নের মত নিজের দেহে গেঁথে নিলেন রঞ্জা। অপার্থিব এক অনুভূতির ভেতর থেকে টিটো যেন কাতরে উঠে বলল, আমার কিন্তু একজনকে কথা দেওয়া আছে, কাকিমা —

— আবার কাকিমা! স্টিম ইঞ্জিনের মত শ্বাস ছেড়ে সাপের দুলুনির মত ভঙ্গীতে শরীরটা বারবার সামনে-পেছনে নিচ্ছিলেন রঞ্জা। হিস্‌হিসানির সঙ্গে বললেন, কেবল রঞ্জা ..... রঞ্জা। তোমার সমস্ত কথা তুমি ওকে দিয়ে দাও। শুধু নিজেকে দাও আমায়। এখনই .... এটুকু সময়ের জন্য!

টিটোর বুকের ওপর দু'হাতের সুদৃশ্য নখগুলো বিঁধিয়ে তাকে শুইয়ে দিলেন রঞ্জা। টিটো তার ঘাড়ের পেছনের অংশটা ধরে তার মাথাটা বুকের ওপর নামিয়ে আনতে চাইল। রঞ্জা কোমরের ওপর দিয়ে নিজের সমস্ত শরীরটা বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। অজান্তে দু হাঁটুর ওপর ভার রেখে সোজা হয়ে গেল টিটো। সে যেন ইচ্ছাবিহীন বাসনা মেটাবার অস্ত্র। কনুইয়ে ভর দেয়া রঞ্জার বিপরীত দিক থেকে তার কোমরে শক্ত আঙুলগুলো বসিয়ে উন্মাদের মত ধাক্কা দিয়ে চলল টিটো। কোন নারীর কণ্ঠ থেকে এমন জোরালো শীৎকারের কথা কখনো শোনেনি সে। ভাগ্যিস বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। নইলে হয়ত এতক্ষণে হেমবুড়ির বাড়ি থেকেই লোকজন চলে আসত এখানে।

নিজেকে সচল রেখেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল টিটো। কি অদ্ভুত জীবন! সামনে নিশ্চিন্ত চাকরীর হাতছানি, ফুলের মত প্রেমিকা। সামান্য কয়েকজন মানুষ-মানুষী। তার ওপর অগাধ ভরসা তাদের। আর সে তারই বন্ধুর মায়ের সঙ্গে। মা! শব্দটা যেন ভিত কাঁপিয়ে দিল টিটোর। আর সেই মুহূর্তেই যেন সব বুঝতে পেরে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে রঞ্জা আবার তার মুখোমুখি হয়ে নিজের বামস্তন তার ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল। সেই অমৃতের স্বাদ নিতে গিয়ে আবারও একবার সব ভুলল টিটো।

রঞ্জার পদ্মগন্ধী শরীরটা বিধ্বস্ত করে এবার যেন আনন্দই পাচ্ছিল টিটো। এতক্ষণের খেলাটা সম্পূর্ণতার দিকে যাচ্ছে। রঞ্জাকে চিৎ করে

শুইয়ে অনেকটা পাশবিক আক্রোশেই যেন নিজেকে নিঃশেষ করল টিটো। নিঃসীম তৃপ্তীতে থরথর করে কেঁপে উঠলেন রঞ্জা। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁকে গভীর ঘুমের মাঝখানে ঢলে পড়তে দেখে টিটোর ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। তারপর একসময় চোখদুটো তারও ভারি হয়ে এল। ফ্যানের শব্দ ছাড়িয়ে বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ তখন আরো তেজিয়ান হয়ে উঠছে। টিটোর মনে হল. একই গল্পের শেষাংশ যেন পরপর বারকয়েক পড়ে ফেলেছে।

আজকের সকালটা কেমন রহস্যে ঘেরা। বিছানায় নগ্ন শরীরটা বিছিয়ে খোলা জানলার বাইরে বৃষ্টির হুটোপাটি অনুভব করার চেষ্টা করছিল টিটো। এত জোরালোভাবে একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে যে কে বলবে, এটা বর্ষাকাল নয়। গলির ভেতরেও দমকা হাওয়ার কারুকাজ শুরু হয়ে গেছে। ছাটের ঝাপটায় জানলার পাশে রাখা টিভি-টার প্লাস্টিক কভারখানা ভিজে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পাল্লাদুটো টেনে জানলাটা বন্ধ করে দিল টিটো। এত বেলাতেও ঘরের ভেতর নিঃসীম অন্ধকার। সুইচ টিপে টিউব লাইটখানা জ্বালিয়ে দিল ও। কিচেনের দিক থেকে খুট্‌খাট্‌ শব্দ ভেসে আসছে। টিটোর একবার সেদিকে যাওয়ার ইচ্ছে হল। পায়ে পায়ে ঘরের খোলা দরজাখানার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল রাতের নাইটিটার ওপর একটা অ্যাপ্রন চাপিয়ে ফ্রেঞ্চ-টোস্ট জাতীয় কিছু একটা ভাজছেন রঞ্জা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখেই যেন লাল হয়ে উঠল রঞ্জার মুখ। মাথা নিচু করে কেমন লাজুক ভঙ্গীতে বললেন, এমা! তুমি কিছু পরে এস, প্লিজ।

টিটো যেন শক্ খেয়ে ভেতরে সরে এল। তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে আলনা থেকে নিয়েই সেটা পরে ভেতরে গিয়ে রঞ্জাকে বলল, পেস্টটা

— বাথরুমে আলাদা ব্রাশ, পেস্ট রেখে এসেছি। মুখ-টুখ ধুয়ে আগে

ব্রেকফাস্ট করে নাও। তারপর.

প্রাতঃকৃত্য সেরে ফেলার কিছুক্ষণ পর কাল সন্ধে থেকে আজ এখন এই সময় অব্দি সমস্ত ঘটনাটাকে পর্যালোচনা করে টিটো অনুভব বরল, মাত্র একরাতে যত উদ্ভট ঘটনার ভেতর দিয়েই তাকে যেতে হোকনা কেন তার মনে কোথাও অশান্তির ছায়াটুকুও নেই। উল্টে যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মত নিজেকে বেশ ওজনদার বলে মনে হচ্ছে!

রঞ্জা কাজ শেষ করে এলেন। অ্যাপ্রনটা খুলে ফেলেছেন। চুলগুলো খোলা। চারদিকে ছাপিয়ে পড়েছে নাইটিটা সাবলীলভাবে খুলে টিটোকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে একগাদা চুমু খেয়ে বসলেন। টিটো বলল, এবার কি?

রঞ্জা বললেন, এবার স্নান! বলেই একটানে টিটোর তোয়ালেটা খুলে নিয়ে বাথরুমের দিকে প্রায় বাচ্চাদের মতই দৌড় লাগালেন। গোঁয়ারের মত তাঁকে অনুসরণ করে বাথরুমের ভেতর ঢুকে সোজা ওর বুকদুটোয় হাত দিল টিটো। রঞ্জার হাতে তখন একটা বডি ম্যাসাজ অয়েলের শিশি উঠে এসেছে। কঠোরভাবে রঞ্জাকে কষ্ট দিতে দিতে টিটো অনুভব করল খুব যত্নের সঙ্গে তার শিরদাঁড়ার ওপর নিজের তেলাল হাতখানা খেলিয়ে দিচ্ছেন মহিলা।

পাক্কা চল্লিশ মিনিট অলিভ অয়েলের ঘোরে ডুবে থাকল টিটো। এত ভাল ম্যাসাজের সঙ্গে তার একেবারেই পরিচয় ছিল না। যাবতীয় শিরশিরানি সত্ত্বেও ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল তার।

রঞ্জা হাত বাড়িয়ে শাওয়ার খুলে দিলেন। টিটোর পিঠের ওপর নিজেকে লেপটে দিয়ে মিহি গলায় বললেন, কাল তুমি বলছিলে না প্রেম কর —

— হুঁ। টিটো সামান্য সচকিত হয়ে ওঠে।

— খুব ভাল। কোর। আমি কখনও প্রেম করিনি জান?

— তাতে বোধহয় আপনার খুব আসুবিধে হয়নি, কি বলেন? টিটো না বলে পারল না।

— ঠুকছ। তবে কি জান, আমি খুব রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড মেয়ে। ন্যাকা ন্যাকা কথা বলে ঝুলোঝুলি আমি কম করিনি। কিন্তু, তোমার সঙ্গে যা যা ঘটেছে এভাবে একটু একটু করে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠাটা আমার এই প্রথম হল। অথচ, আমরা তো প্রেমিক-প্রেমিকা নই। কিন্তু, এ আনন্দটুকু কি মিথ্যে?

রঞ্জার গলাটা যেন একটু ধরা মনে হল টিটোর। হাল্কা জলের ছড়ির নীচে বসে এই কথোপকথনকে তার অদ্ভুত মনে হলেও সে বলল, গল্পে, ফিল্মে যে সব সেক্স স্টার্ভড মেয়েদের পরিচয় পাই বাস্তবে যে তাদের কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে এটা ভাবতে পারিনি।

রঞ্জা একটু সরে গেলেন। টিটোর পিঠে এখন তার পিঠ। শাওয়ারের জলের তীব্রতা আরেকটু বাড়িয়ে দিল টিটো। রঞ্জা বললেন, আমাকে ঘরের ভেতর প্রথম দেখেই তুমি লোভী হয়ে উঠেছিলে, ঠিক কিনা বল? আমি বাজি রাখতে পারি আগেও আমাকে নিয়ে তুমি খারাপ স্বপ্ন বানিয়েছ। যেমন অল্পবয়সে সবাই করে।

— হ্যাঁ। টিটোকে স্বীকার করতে হল।

-- তাহলে স্টার্ভেশনের অসুখ আমার একচেটিয়া নয়। বন্ধুর জন্মদাত্রীর সঙ্গে তুমি শুয়েছ আর সে'ও শুয়েছে তার ছেলেরই মত কারো সঙ্গে। খুব প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই। নইলে আমরা তো রোজ এমন করিনা। আসলে আমাদের ভেতরকার ঘটনাটা কোন সমাপতনজনিত ব্যাপার নয়। আমি অনেকদিন থেকেই তোমায় অবজার্ভ করছি। দায়িত্ববান পুরুষদের মেয়েরা ঠিকই চিনে নিতে পারে। বয়সটা সেখানে ম্যাটার করেনা। সক্ষম ছেলেদেরও চেনা যায়। তুমি আমার ছেলের বন্ধু না হয়ে অন্য কারো

বন্ধু হলেও আমার অন্তত কিছু যেত আসত না।

-- কিন্তু, কাকিমা ...... মানে, রঞ্জা...... আমরা যা করে বসলাম সেটা তো বিশুদ্ধ পাপ।

— আমার কাছে পাপের সংজ্ঞাটা অত সোজা না। মানুষের পেটের কষ্ট তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করাটাই আসল পাপ। খিদে, প্রেমহীনতা, শূন্যতা দেখে সমাধানের চেষ্টা না করে যাবা সেসব নিয়ে ব্যবসা করে তারা আমাদের চাইতেও ঘোরতর পাপী।

— কিন্তু, আমার তো এটা প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি এটা কি করে ভুলব?

— ভুলোনা। আবার প্রচার করেও বেড়িও না। তাহলে আমার চেয়ে তোমার মুশকিলই বেশী হবে। তা, তোমার প্রেমিকাটির নাম কি?

আচমকা প্রসঙ্গ পরিবর্তনে একটু যেন কেঁপে উঠল টিটো। বলল, মহিমা। প্রফেসার মন্মথ রায়চৌধুরীর মেয়ে। আমাদের মেসের কয়েকটা গলির পরে বাড়ি ....

ভ্রু কুঁচকে গেল রঞ্জার। বললেন, নিশ্চয়ই সুন্দর খুব?

—হ্যাঁ। ভীষণ! টিটো মাথাটা নিচু করে বলে, রজত চেনে না।

— ও পৃথিবীর সমস্ত অষ্টাদশীকে চিনে ফেলবে এতটা এলেম ওর নেই। নিজের মাকেই যেখানে এতগুলো বছর দেখেও চিনতে পারলনা........

— আমার কিন্তু অস্বস্তি হচ্ছে।

— আরে, ও কিছু জানবে না। ওর মা যে অলরেডি অনেক কেষ্টবিষ্টু বধ করে আরো অনেক বড় দিকে এগোচ্ছে ও কী সেটা জানেনা মনে করছ? এতে ওর আহ্লাদ বাড়ে! এখন তো টি ভি সিরিয়ালে অভিনয় করছি শুনে আনন্দে ফাটছে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ওড়াবার স্কোপ পাবে।

একদম ওর বাবার মতন ....

—আপনি সিরিয়ালে অভিনয় করছেন! কই আমাদের বলেনি তো?

—বলবে। সবই বলবে। সারপ্রাইজ দেবে আরকী! দুটো মেগায় নিজেকে নিংড়ে মা মাসে মাসে চল্লিশ হাজার করে আনবে .... ছেলের কত গর্ব বলত!

—দুটো মেগা! একসঙ্গে?

—দু'সপ্তাহের ভেতরেই পাবলিসিটি শুরু হয়ে যাবে। দেখতেই পাবে সব। এর ওপর নির্ভর করেই জীবনের সমস্ত সঞ্চয় লাগিয়ে বিরাটিতে একটা বাগানবাড়ি পর্যন্ত কিনে ফেলেছি। ফোর হুইলারও ম্যানেজ করেছি একটা। সেকেন্ড হ্যান্ড অবশ্য। সামনের মাস থেকেই ব্যবহার করা যাবে।

—এতকিছু হয়ে গেছে? রজত একটা কথাও বলেনি।

— এগুলো ও এতটা জানেনা। কাগজপত্র আমার ল ইয়ার আর ব্যাঙ্কের ভল্টেই বেশি রাখা থাকে। তাছাড়া, আমি ঠিক করেছি এ ফ্ল্যাটটা বাবদ যা পাওয়া যাবে তার সবটুকুই ওকে দিয়ে আমি আলাদা হয়ে যাব। ন্যাচারেলি ওকেও আলাদা হয়ে যেতে হবে।

—একমাত্র ছেলেকে আলাদা করে দেবেন?

—কি হয়েছে তাতে? আমরা তো মানসিকভাবেও বিচ্ছিন্ন। হেমবুড়ির যে পরিণতি হল সেটা আমার নিজের ক্ষেত্রেও হোক এটা কি আমার চাওয়া উচিত? তুমিই বল?

—কোথায় আপনি আর কোথায় হেমবুড়ি! রজত এ ঘটনাটার খুব নিন্দে করছিল।

—ওটা জনসমক্ষে নিজের ইমেজ বজায় রাখার জন্য।

হাত বাড়িয়ে শাওয়ারটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন রঞ্জা। দেওয়ালের হুক থেকে একটা তোয়ালে নামিয়ে মাথায় পেঁচিয়ে বললেন, ওকে ভালভাবে ওয়াচ করনি? যেখান থেকে ওর নিজের কোনকিছু হবার সম্ভাবনা নেই সেখানকার সবকিছুই ওর খারাপ। আমার মনে হয় দালালিটা পেশা করে নিলে ও ভাল জায়গায় পৌঁছতে পারবে। আরে, হেমবুড়ির ছেলেদের কথা বলিস! তুই নিজে কত ভাল রে? জীবনে কোনদিন কিছু হাতে করে এনে বলেছিস, মা, এটা তোমার জন্য আনলাম।

ছেলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে রঞ্জা বেশ সাবলীল ভাবেই ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। টিটো আরেকটা তোয়ালেয় শরীরের জল মুছে রঞ্জাকে অনুসরণ করল।

ঢিলে একটা কাফ্‌তান শরীরে চাপিয়ে নিয়েছেন রঞ্জা। কোন উপায়ন্তর না দেখে রজতেরই একটা পায়জামা পরে নিতে বাধ্য হল টিটো। জানলার বাইরে আকাশ যেন ভেঙে পড়ছে। রঞ্জা খাটের ওপর বসে পড়ে পা দুটো দোলাতে দোলাতে বললেন, এই প্রলয়ের মধ্যে আমি তোমাতে ছাড়তে পারব না। সে তুমি আমাকে যাই মনে কর।

টিটো বলল, আর অপেক্ষা করলে অসুবিধা হয়ে যাবে। ঝড়, জল যাই হোক আমি আর আধঘন্টা বাদেই বেরোচ্ছি।

উঁহু! দুষ্টুমির হাসিতে মুখখানা লাল করে রঞ্জা বললেন, যখন সুযোগ পেয়েছি তোমাকে আজ দুপুরে আমার রান্না না খাইয়ে ছাড়ছি না।

—খাওয়ানোর পর ছাড়বেন তো? অনেকটা বোকার মতই কথাটা বলে ফেলল টিটো।

— ছাড়ব, তবে তোমাকে আরো একবার চিবিয়ে খাবার পর। কথাটা বলেই শরীরে ঢেউ তুলে খাট থেকে নেমে কাফ্‌তানটা দু'হাতে সামান্য উঁচু করে ধরে পায়ের গোছ দেখিয়ে প্রায় দৌড়নোর ভঙ্গীতে রান্নাঘরে চলে গেলেন রঞ্জা।

সেই মুহূর্তে এই অদ্ভুত অনুশোচনাবিহীন মহিলাকে ঝাপটে ধরে একটা চুমু খাবার দারুণ ইচ্ছে হল টিটোর।

নিজের লেখা সদ্য শেষ হওয়া চিত্রনাট্যের পাঁজার দিকে তাকিয়ে নিজেরই কষ্ট হচ্ছিল জিতু গোস্বামীর। এবারও কোন ঝুঁকি নিতে পারল না সে। সেই থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড়। একেবারে রুটিনধর্মী সাসপেন্স থ্রিলার। পাঁচটা বিদেশী গোয়েন্দা-উপন্যাস গুলে যা বেরিয়েছে তাতে লোকে এবারও তাকে ভিতু গোস্বামী বলে ডাকবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে মাথার ঘোলাটে ভাবটা একটু কাটাবার চেষ্টা করল জিতু। আমজনতাকে তার এঁচোড় জনতা মনে হয়। এঁচোড়ে পাকা বোদ্ধা একেকটা। এমন ভয়ংকর সব মন্তব্য ওদের তরফ থেকে তার কানে ভেসে আসে যে তার শরীর গরম হতে থাকে। এইসব হুঁকোমুখো দল মুম্বাইয়ের চতুর্থ শ্রেণীর মাল খেয়েও তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। আর বাংলা ভাষার মুখোমুখি হলেই যেন এদের সমালোচনাপ্রবৃত্তি অমোঘ চুলকুনির মত জেগে ওঠে। এরা জানেনা একেকটা বাংলা সিরিয়াল তৈরির পেছনে কত জটিল অঙ্ক, ছক আর কাঁচিবাজি কাজ করে!

নিজের অতীতের দিকে একবার ফিরে তাকাল জিতু। তার জীবনযাপন যত সাহসী মোড়ই নিক না কেন এদেশের পর্দায় সে সব সম্ভবত কোনকালেই দেখান যাবেনা। কেননা, জিতুর ধারণা, ভারতবর্ষে সৃজনশীল শিল্প-সাহিত্য বলে যা চলে সে সবের ওপর সূক্ষ্ম রুচিশীলতার একটা পর্দা জোর করে চাপান থাকে। এরই মাঝখানে যে সব সাহসিনী মহিলা-পুরুষ উত্তর-আধুনিকতার দোহাই দিয়ে ইংরাজী ভাষায় একেকটা ছাগলাদ্য উপন্যাসের জন্ম দিয়ে যাচ্ছেন তা বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বরও সহ্য করতে পারবেন না। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথাটা যেন এদের একেবারেই মাথায় থাকে না। অথচ, আজকের একজন সফল চিত্রনাট্যকার হয়ে ওঠার জন্য নিজের আত্মাও বিক্রি করে দিয়েছে জিতু।

যাবতীয় লেখালেখির এই প্রয়াস জিতুকে কেবল হাসায়। যেমন, এখনই চিত্রনাট্যের প্যাকেটটা দেখে মৃদু মৃদু হাসছে ও। জিতু জানে, কোন্ ভূষিমাল যে সে প্রযোজক-পরিচালকের ঘরে গছাচ্ছে তা মগজ খাটিয়ে কারো পক্ষে বার করাটা ঘটলেও তার সামনে এসে বলতে সাহসে কুলোবে না। তাছাড়া তার আগেকার সমস্ত চিত্রনাট্যই হিট। এই বাজারে একসঙ্গে দুখানা মেগা সিরিয়াল রমরম করে চলছে তার। রেটিং-এ দুটোই তালিকার একেবারে ওপরের দিকে। সামনে আরো যে দুখানা মেগা আসছে তারই একখানার কাঁচামাল এই মুহূর্তে তার সামনে মুক্তি প্রতিক্ষায় অপেক্ষা করছে। তবে এই দুটো সিরিয়াল নিয়ে ঝামেলা আছে। কেবলমাত্র চিত্রনাট্য লিখে এখানে তার মুক্তি নেই। আসলে, জিতুর লড়াইয়ের দিনগুলোতে এই প্রোজেক্ট দুটোর মালকিন মহিলাটি নানাভাবে উপকারে এসেছিলেন। সে প্রায় বছর দশেক আগেকার কথা। দূরদর্শনে তখনও সিরিয়াল ব্যাপারটা এতটা সহজলভ্য হয়ে যায়নি। আরো অনেক উঠতি লেখকের মত জিতুরও তখনও পয়সার টানাটানি চলছে। সদ্য রিটায়ার্ড বাবা আর অসুস্থ মাকে নিয়ে হিমসিম অবস্থা। ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিসে জমানো পারিবারিক সঞ্চয় হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সাধারণ বি.এ পাশ ছেলে জিতু। একেবারেই সাহিত্যপাগল তখন। অন্যান্য উদ্যোগী বন্ধু-বান্ধবের মত কিছুটা টাইপ-শর্টহ্যান্ড বাকিটা কম্পিউটার — এসব টানা-হ্যাঁচড়ার ভেতর কখনও যায়নি ও। কেন জানিনা, তার মনের গভীরে কোথাও বিশ্বাস ছিল উন্নতি বলে কোন শব্দের সঙ্গে তার এ জীবনে যদি পরিচয় হয়ও তবে তা হবে লেখালেখির মাধ্যমে।

সে সময় গল্প-কবিতাই লিখত জিতু। কখনও সখনও ফীচার। বহু ম্যাগাজিনের কভার স্টোরিও লিখতে হয়েছে তাকে। এ সবকিছুই পয়সার জন্য। সারাদিন ট্যুইশান আর লেখালেখি থেকে যা পেত সেসব বাবা-মায়ের জন্য ব্যয় করে ফেলত। এরপর বাবা মারা গেলেন। উইডো পেনশানের কিস্তি চারেক পাবার পর মা-ও চলে গেলেন।

জিতু ভেবে দেখেছে, মার এই চলে যাওয়াটা এক ধরণের অমোঘ

ব্যাপার। বাবার সঙ্গে অদ্ভুত নিয়মের এক নিগড়ে বাঁধা ছিলেন মা। তিরিশ বছরের বিবাহিত জীবন তাকে পূর্ণতা দিয়েছিল। অসুস্থ হলেও মায়ের চোখেমুখে এক গভীর বিশ্বাস আর আনন্দের মিশ্রণ দেখতে পেত জিতু। বহু যত্নে আর ভালোবাসায় বাবাই মাকে মানসিকভাবে সাজিয়ে তুলেছিলেন কিন্তু ওদের দুজনের আরো কিছুদিন পাশাপাশি বেঁচে থাকাটা আর ঘটে ওঠেনি।

বাব-মা পরপর চলে যাওয়ায় জিতু যে খুব একটা ভেঙে পড়েছিল এমন নয়। তবে, মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে দু'দুটো দুর্ঘটনার ধাক্কা তাকে রাতারাতি কর্মক্ষম করে তুলেছিল। যশোর রোডের ধারের একটা পাড়ার ভেতর তার বাড়ি। সাতের দশকের একদম শেষে এটা তৈরি করেন বাবা। বস্তুত এতেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে জমান টাকার পঁচাত্তরভাগ খুইয়ে বসেন। স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য তার এতটুকুও ইচ্ছে ছিলনা বাড়ি-টাড়ি বানানোর কোন শৌখিনতার চরিতার্থসাধন করার। কিন্তু, জিতু দেখেছে মায়ের প্রবল ইচ্ছে ছিল, তাদের নিজস্ব একটা বাড়ি হোক। মা বোধহয় অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না।

এহেন বাড়িটাই একসময় জিতুর অভিভাবকের ভূমিকা নিল। ওর শুভাকাঙ্খীদের ভেতর একজন চমৎকার এক পরিবারকে তার ভাড়াটে হিসেবে জুটিয়ে দিয়ে গেলেন। ছোট্ট সংসার। স্বামী, স্ত্রী আর একফোঁটা একটা মেয়ে। নিজের তিনখানা ঘরের দু'খানাই সে পত্রপাট তাদের ভাড়া দিয়ে দিল। বাথরুমসমেত সে অংশটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায়। বাকি ঘরখানা বেশ বড়। অ্যাটাচড্ বাথ সমেত সেটাকে নিজের দায়িত্বে রাখল জিতু।

ভাড়াটেদের দেওয়া অ্যাডভান্সের টাকায় মনোরমভাবে তাদের ফ্ল্যাটখানা সাজিয়ে দেবার পরও বেশ কিছু টাকা হাতে থেকে গেল জিতুর। আর সেই টাকা দিয়েই শুরু হল তার অভিযান।

মা-বাবার শ্রাদ্ধশান্তির খরচ মেটাবার পর থেকে টাকার চিন্তায় রাতের ঘুম উরে গেছিল জিতুর। বাড়িভাড়া বাবদ টাকাটা পেয়ে একটা দুশ্চিন্তা অন্তত কাটল যে, না খেয়ে মরতে হবে না।

তার যে ঐ'রকম শিরে সংক্রান্তি চলছে জিতু সেটা তার আদবকায়দায় প্রকাশ হতে দিতনা। বাইরে থেকে তার বাড়িঘরের চেহারা দেখেও বোঝা যেতনা দশাটা সত্যি সত্যিই শনির। কিন্তু, কয়েকজন বুদ্ধিমান বন্ধু-বান্ধবী ব্যাপারটা ঠিকই ধরে ফেলেছিল। তারা সবাই-ই তখন মন্মথ স্যারের কোচিং স্কুলের সঙ্গে জড়িত।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা সরু গলির ভেতর মন্মথবাবুর বাড়ি। পুঁচকেপানা পুতুল পুতুল গোছের একখানা মেয়ে ছিল স্যারের। নাম-মহিমা। তাকে আর স্ত্রীকে, এই দুটিমাত্র প্রাণীকে নিয়ে বনেদী সেই বাড়ীখানায় থাকতেন স্যার। তখন সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেছেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এতটাই ভাব যে অনেকসময় তাকেও ছাত্র ভেবে ভুল করতেন প্রবীণ অধ্যাপকদের কেউ কেউ। স্যারের চেহারাটাও ছিল এই ভাবনার অনুকূলে। খুবই ইয়াং দেখাত।

জিতুর অবস্থার কথাটা যখন তার বন্ধু-বান্ধবীরা মন্মথ-স্যারের কানে তুলল তখন বেশ অবাকই হলেন তিনি। উনি বরাবর জানতেন জিতুদের পারিবারিক অবস্থাটা বেশ স্বচ্ছল। ছাত্র থাকাকালীন তার একমাসের মাইনেও কখনও বাকি পড়েনি। এই যে মাসকয়েকের ভেতর তার বাবা-মা দুজনেই মারা গেলেন তখনও এই চাপের ব্যাপারটা ধরতে পারেননি তিনি। এহেন জিতুর সমস্যাটা বুঝে নিতে বেশ খানিকটা সময়ই নিয়ে ফেলেছিলেন স্যার। তারপর সরাসরি এক ভদ্রমহিলার ঠিকানা তাকে দিয়ে বলেছিলেন, তুই যখন নাটক-টাটক করিস বা লিখিস তখন চলে যা। কপালে থাকলে ওখান থেকেই করে খাবি।

আজ সেখান থেকেই করে খাচ্ছে বটে জিতু। বিনতা রায়চৌধুরীর মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহিলা দূরদর্শনে সিরিয়ালগুলোর বিরাট সম্ভাবনার কথা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। জিতুর প্রায় কাঁপা কাঁপা হাতে বাড়িয়ে দেওয়া নাটকের পান্ডুলিপিগুলো থেকে একটা বেছে নিয়ে ঘন্টাখানেক নিবিষ্টভাবে পড়ার পর তাকে বলেছিলেন, আমি একটা ছোটগল্প আপনাকে দিচ্ছি। আপনি কালকের মধ্যে ওটাকে একটা

চিত্রনাট্যের শেপ দিয়ে আমার কাছে এনে দিন তো।

— কালকের মধ্যে! জিতু না বলে পারেনি।

— হ্যাঁ। কালই চাই। পাতা কুড়ি মত লিখলেই চলবে। গল্পের বাইটটা বজায় রেখে একপর্বের উপযোগী চিত্রনাট্য যেমন হয় আর কি—

— গল্পটা দিন। সাত-পাঁচ না ভেবেই বলে ফেলেছিল জিতু।

হাত বাড়িয়ে কাবার্ডের ওপর রাখা একটা লম্বামত প্যাকেট তুলে নিয়ে তার হাতে দিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন দেখলেন উনি। তারপর বললেন, কাল রাতে আটটার ভেতর অবশ্যই চলে আসবেন। ঠিক এইখানে।

পরেরদিন সন্ধ্যা সাতটায় দুরু দুরু বুকে অফিসঘরে লম্বা একখানা সোফায় বসে অপেক্ষায় মৃদু মৃদু ঘাম দিচ্ছিল জিতুর। যদিও ঘরখানা শীততাপনিয়ন্ত্রিত।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটার সময় বিনতা এসে ঢুকলেন। সাধারণ তাঁতের শাড়ি, শাঁখা, সিঁদুরে তাকে যে কোন বাঙালী গৃহবধূর মত দেখাচ্ছে। বিনতা ঘরে ঢোকার কয়েক সেকেন্ডের ভেতরই এমন আরেকজন এসে উপস্থিত হল যে সাময়িকভাবে জিতু নিজের হাতে ধরা প্রথম চিত্রনাট্যটার কথাও বেমালুম ভুলে গেল।

মেয়েটা চন্দ্রিমা সেন। গত তিন বছর ধরে বাংলা সিনেমার দর্শকরা যাকে সবচেয়ে আবেদনময়ী বলে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে, পত্র-পত্রিকায় যার প্রশংসায় বিশেষণমালা শেষ হতে চায়না সেই চন্দ্রিমা সেন তার সামনে! জিতু ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। বিনতাদেবীর অল্পবয়সী পি.এ মেয়েটি সেই যে তাকে এখানে বসিয়ে রেখে চলে গেছে আর তার দেখাই নেই। বোধহয় আজকের মত ওর ছুটি হয়ে গেছে।

চন্দ্রিমা যখন তার উল্টোদিকের সোফাটায় এসে বিনতার ঠিক পাশটিতে বসল তখন অস্বস্তি কাটাবার জন্য চিত্রনাট্যের ফাইলটা তাড়াতাড়ি বিনতার হাতে দিল জিতু।

বিনতাকে সামান্য অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। ফাইল থেকে চিত্রনাট্যের পাতাগুলো বার করে চোখ বুলোতেই দারুণ মনোযোগী হয়ে উঠলেন হঠাৎই। পাকেচক্রে সেই মুহূর্তে চন্দ্রিমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল জিতুর।

গা কামড়ানো জিনস্ আর ঢিলে গেঞ্জিতে ফরাসী মডেলদের মত দেখাচ্ছিল চন্দ্রিমাকে। তার উচ্চতা ঈর্ষণীয় রকমের বেশি। সামনে থেকে দেখে জিতু বুঝল এতদিন যাকে সে টকটকে ফর্সা ভেবে ভুল করে এসেছে আসলে সে নিখাদ এক শ্যামলা মেয়ে। তবে, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করার মত। অ্যাডভান্সড ইয়োগার ওপর দারুণ দক্ষতা আছে তার, মেয়েটার একথা জিতু সংবাদপত্র থেকেই জেনেছে। কোমরটায় চর্বির লেশমাত্র নেই। স্তনের প্রাচুর্য্য দেখে মনে হচ্ছে গেঞ্জির নীচে কিছু পরেনি মেয়েটা। একমাথা এলোমেলো চুল পেছনদিকে টেনে একটা খয়েরি ব্যান্ড পরেছে মেয়েটা। ভঙ্গিটা অনেকটাই নিগ্রো মেয়েদের মত।

বোধহয় একটু বেশি সময়ই মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিল জিতু। চন্দ্রিমা যখন সামান্য হেসে একবার মাথা নিচু করে পরক্ষণেই বিনতার দিকে তাকাল তখনই জিতুর চট্‌কা ভেঙ্গে গেল। খুব অপ্রতিভ হয়ে পড়ল ও। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মুখখানা একটু তুলে বিনতা বললেন, আপনার লেখা আমার পছন্দ হচ্ছে।

জিতুর মনে হচ্ছিল কেউ যেন তাকে একটা আগ্নেয়গিরির ভেতর পড়ে যাওয়া থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল।

বিনতা নম্র ধীর গলায় বলে চলছিলেন, আমি অবশ্য ঠিক সপ্তম পাতায় রয়েছি তবুও বলতে পারি, আপনি এমন কিছু আমার হাতে তুলে

দিয়েছেন যতটা আমি নিজেও এক্সপেক্ট করতে পারিনি। এনি ওয়ে, এগ্রিমেন্টের কাগজপত্র রেডিই আছে। আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যান। দু'দিন দেখুন, ভাবুন। ইচ্ছে হলে আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন। আর এই লেখা বাবদ টাকাটা এখনই নিয়ে যান। তবে, কাল আরেকবার এসে এটা আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। আজ রাতটুকু ভাল করে এটা পড়ে দেখে নিই। একটু ব্রাশ আপ্ করার প্রয়োজন থাকতেও পারে। সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু আরেকটা দিন ব্যয় করতে হবে।

কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে খানিকটা আবোল তাবোল কথা বলার ঝোঁকটুকু সামলে নিল জিতু। কারণ, চন্দ্রিমা তখনও ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

এতক্ষণে বিনতা চন্দ্রিমাকে দেখিয়ে জিতুকে বললেন, ওর পরিচয়টা আশাকরি —

— চিনি। জিতু ঢোঁক গিলে বলল।

— আপনার প্রথম চিত্রনাট্যের প্রথম নারী চরিত্র কিন্তু ও-ই হতে চলেছে। অতএব, আপনাদের ভেতর একটা আলাপ-আলোচনার ব্যাপার থাকলে রোলটা দাঁড় করাতে সুবিধে হবে। তাছাড়া, শুটিং-টা আমি দু'সপ্তাহের ভেতরই শুরু করব। এছাড়া এরপর বর্ষা এসে গেলে আউটডোরে কাজ করা মুশকিল হয়ে যাবে।

— তাহলে তুমি এটার একটা কপি আজই আমাকে দিয়ে দাও বিনতাদি। এরপর কি রকম বিজি হয়ে পড়ব তুমি তো জানই। আদুরে গলায় বলল চন্দ্রিমা।

এখানে একটা এক্সট্রা কার্বন কপি দিয়ে উনি অনেকটা সুবিধে করে দিয়েছেন। এটাই নিয়ে যা। কিন্তু, আমি না বললে আর কাউকে দিস না। কাকে কোথায় কাস্ট করব সেটা কিন্তু এখনও পুরোপুরি ভেবে উঠতে পারিনি। অনেকটা আস্কারা দেবার ভঙ্গিতেই বললেন বিনতা।

জিতুর ক্রমশই সবকিছু ভাল লাগছিল। আরো ভাল লাগল যখন চন্দ্রিমা বলল, আজ আমার আর একটুও সময় নেই। কাল যখন আসবেন তখন বরং জমিয়ে গল্প করা যাবে।

বিনতা উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের আরেকদিকের সেক্রেটারীয়েট টেবিলটার কাছে গেলেন। খামের বক্স থেকে লম্বা একখানা খাম নিয়ে চিত্রনাট্যের কার্বন কপিখানা যত্ন করে সেটায় ভরলেন। চন্দ্রিমা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। খামখানা হাতে নিয়েই বিনতাকে সে বলল, আমি তাহলে এখন আসি বিনতাদি।

—যা। কিন্তু, মনে রাখিস, কাল সাতটার পর এলে আর ঢুকতে দেব না।

জিতুকে আরেকটু মিষ্টি হাসি উপহার দেবার পর উত্তেজক চেহারাটায় মারাত্মক একখানা মোচড় দিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল চন্দ্রিমা। জিতুর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল পেছন পেছন খানিকদূর যায়, কিন্তু বিনতার সিরিয়াস মুখখানার দিকে তাকিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে রইল সে।

তার মনের ভেতরটা যেন পড়ে নিতে চাইছিলেন বিনতা। বললেন, আসুন। আপনার পেমেন্টটা ক্লিয়ার করে দিই।

মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে দাঁড়াল জিতু। মিনিটখানেকের ভেতরই তার হাতে উঠে এল কড়কড়ে কয়েকখানা একশ টাকার নোট।

ভেতরের আবেগ চেষ্টা করেও যেন আটকাতে পারছিলনা জিতু। কিন্তু, কিছু বলে ওঠার আগেই বিনতা বলে উঠলেন, কাল আপনাকে এককাপ চা-ও আমি খাওয়াতে পারিনি। আসলে আমার স্বামী, সন্তান আর কাজের ছেলেটা সকলে আমার শ্বশুড়বাড়ি ..... মানে, দেশের বাড়িতে গেছে সেজন্য সবকিছুই অগোছালো হয়ে পড়ে আছে।...... একটু বসুন,

আমি দাদাকে ফোনে আপনার ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েই আসছি।

—দাদা! দাদা কে? একটু অবাক হয়ে গেল জিতু।

—ওমা! জানেন না? আপনার এক্স-মাস্টারমশাই মানে মন্মথ রায়চৌধুরীই তো আমার দাদা। আমার ঐ একটিই দাদা। যখনই ভাল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি তখনই দাদাকে ফোনে সেটা জানিয়ে দেওয়াটা আমার অনেকদিনের অভ্যাস। বাচ্চা কোন মেয়ের খুশি খুশি গলায় বললেন বিনতা।

এরপর এক বোতল কোল্ড ড্রিংকের সঙ্গে একপ্লেট কাজু ধ্বংস করে রাস্তায় বেরোনোর পরও যে প্রশ্নটা জিতুর সামনে ঝুলে রইল তা হল, স্যার যে তার নিজের বোনের কাছেই তাকে পাঠাচ্ছেন সে কথাটা তাকে আগেভাগেই বলে দিলেন না কেন?

অর্ধেক ঘুমের ভেতর থেকে যেন জেগে উঠল জিতু। সামনের টেবিলের ওপর রাখা কাগজগুলো হালকা হাওয়ায় ফরফর করে উড়ছে। দশ বছর! এই চলমান দুনিয়াতেও বড় কম সময় নয়। এ ক'বছরে অনেক কিছু পেয়েছে জিতু। অর্থকৌলিন্য, সম্মান ছাড়াও মিডিয়াগুলো কম প্রচার করেনি তার কাজ নিয়ে। এই আটত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে সমবয়সী বহু গুণী মানুষের চেয়ে সে যে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে এটা তার প্রচ্ছন্ন গর্বের একটা কারণ।

কিন্তু, যে ধরণের কাজে তার নিজের অনীহা আর সকলের উৎসাহ অর্থাৎ হিন্দি ফিল্মের জগতে কোন বড় তো দূরের কথা মাঝারি মাপের সাক্ষরও সে রাখতে পারেনি।

চিন্তাটা কাঁটার মতএসে বিঁধল জিতুকে। সে চেষ্টা করলেও পারেনি। এই দশ বছরের ভেতর বহুবার সুযোগ এসেছে তার কাছে তা সত্ত্বেও ব্যর্থ

হয়েছে সে। প্রথমবারই এক বাঙালী পরিচালকের হিন্দি-বাংলা দ্বি-ভাষিক ছবিতে সুযোগ পেয়েছিল। খুব খেটেছিল চিত্রনাট্যের পেছনে। কিন্তু, পরিচালক লোকটা যে এমন পগেয়া পাজি স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সে। তার অমন একটা বিরাট চিত্রনাট্য কেটে ছেঁটে নিজের সংলাপ বসিয়ে সিকোয়েন্সগুলোকে রাতারাতি বদলে এমন একটা বস্তু লোকটা পর্দায় হাজির করল যে মিনিট দশেক দেখলেই শিউরে উঠতে হয়। অমন সাধের চিত্রনাট্যের এহেন করুণ পরিণতি দেখে জিতুর কান্না পেয়ে গিয়েছিল। এরপরের ঘটনা মর্মান্তিক। সপ্তাহ দেড়েকের ভেতর হল বেবাক ফাঁকা। সাড়ে তিন কোটির ধাক্কা সামলাতে না পেরে দুই প্রযোজকের একজনতো সুইসাইডই করে বসলেন আর আরেকজন, সম্ভবত সিনেমা নামক বিভীষিকার হাত থেকে মুক্তি পেতেই গ্রামাঞ্চলে গিয়ে শুয়োরের খোঁয়াড় খুলে ফেললেন। জিতু যতদূর জানে শুয়োরেরা অন্তত ঠকায়নি লোকটাকে। বেকনের ব্যবসায় সে এখন ভারতবর্ষের প্রথম পাঁচজনের একজন।

এ ঘটনার বছর তিনেক বাদে যখন প্রাইভেট চ্যানেলগুলো রমরমিয়ে ব্যবসায় নেমেছে তখন একটা হিন্দি সিরিয়ালের চিত্রনাট্য লিখেছিল জিতু। মানে, লিখেছিল বাংলায়, অনুবাদটা হয়েছিল হিন্দিতে। অ্যাভারেজ ব্যবসা দিয়েছিল সিরিয়ালটা। কিন্তু, তারপর থেকে আজ এই এতদিন পর্যন্ত হিন্দিওলারা আর টুঁ শব্দটিও করেনি। এই হেরে যাবার ব্যাপারটাই কেবল মানতে পারেনা জিতু।

চেয়ার ছেড়ে উঠে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে জিতু ভাবল, এবার এই ব্যাপারটার শেষ দেখে ছাড়বে সে। এতদিনে তার পরিচয়ের গন্ডিতে এমন একজন এসেছে যে জিতু গোস্বামীর নামের মানুষটার উপকারের জন্য অনেকদূর যেতে পারে। বিশেষ করে নিজের জন্য তো পারেই। মহিলার সমস্ত শরীরে, বিশেষত চোখদুটোয় জয়ের আগুন দেখেছে সে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে তার কথাই ভাবছে জিতু। রঞ্জার কথা! রঞ্জাবতী দত্তের।

ঢাকের আওয়াজ ডিঙিয়ে খুট্ করে একটা শব্দ হতেই পিছন ফিরে তাকাল মহিমা। ফিরতেই বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। ছাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে টিটো!

মহিমা প্রায় ছুটে তার কাছে এসে বলল, তুমি! এই সময়ে?

টিটো শুকনো হেসে বলল, ভাল লাগছিল না। মেসটাও একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। সারাদিন বৃষ্টিতে এক গল্পের বই পড়া ছাড়া তো আর কোন কাজ করার উপায় নেই, ... বোর লাগছিল। ভাবলাম, গিয়ে দেখি তুমি কি করছ। বৃষ্টিটাও যখন ধরে এসেছে —

মহিমা মুখটা একটু নামিয়ে বলল, আমারও ভাল লাগছিল না। তাই ছাদে এসে একটু ঘুরছি।

টিটো এদিক ওদিক দেখে বলল, এখান থেকে কিন্তু কলকাতার একটা অন্য ছবি পাওয়া যায়। বেশ লাগে।

মহিমার মনের মেঘটুকু সরছিল। একটুখানি খুশিয়াল গলায় সে বলল, আমার সঙ্গে এদিকটায় এস। আলোগুলো এখান থেকে কি দারুণ দেখাচ্ছে দেখ।

মহিমার একটা আঙুল আলতোভাবে ধরে ছাদের কোনার একটা বিশেষ দিকে চলে এল টিটো। ছাদের এদিকটা থেকে কলেজ স্কোয়ারের পুজোর আদলটা বোঝা যায়। যেন কতগুলো আলোর থাম আকাশে উঠে গেছে। বিচিত্র বর্ণের জড়াজড়ি যেন শূন্যের ভেতর বেশ কিছুটা অঞ্চল জুড়ে চলছে। মহিমা টিটোর হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরল। টিটো বলল, বাঃ।

সারাদিন বৃষ্টি হয়ে মেঘের জট ছেড়ে গেছে। তারই ফাঁকফোঁকর দিয়ে দু'চারটে সাহসী তারা বেরিয়ে এসেছে। হু হু হাওয়ায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে টিটো। ঠিক সেই মুহূর্তেই মৃদু গলায় মহিমা বলে উঠল, তুমি আজকাল রজতদাদের বাড়ি যাওনা?

একটু শক্ত হয়ে উঠল টিটোর শরীর। মুখখানা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে সে বলল, কেন বলত?

মহিমা স্বাভাবিকভাবেই বলল, না। ঐ যে ফুলউলি মেয়েটা গোবরডাঙা থেকে আসে ও-ই পরশুদিন মাকে বলছিল, মাস্টারদাকে দেখলাম বৃষ্টির মধ্যে রজতদাদের গলি থেকে বেরুচ্ছে। ও তো রজতদাকে চেনে। বোধহয় কাছেপিঠে ফুল-টুল দিতে গিয়েছিল

—ওঃ! ওই মেয়েটা! এবার পুজোতেও তো নাকি ক্লাবে ফুল দিয়ে যাবে। ঠিকই দেখেছে। রজত হারামজাদা ডেকরেটার্সের ওখানে যাবে বলে সকালে আমাকে ডেকে পাঠাল। দুটো টুটো নাগাদ যাওয়ার কথা। তা গিয়ে দেখি, আগেই কোথায় বেরিয়ে গেছে। ছাতাটা আবার সেদিন একজন ধার নিয়ে মানিকতলা গেছল। অগত্যা আমাকে ভিজে ভিজেই ফিরে আসতে হল। সর্দিটর্দি লেগে সে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার। ক'দিন কি রকম কাশছিলাম দেখলে না?

কথাগুলো মহিমা কিভাবে নিচ্ছে দেখার জন্য তার চোখে চোখে রাখল টিটো। অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ওকে। হাওয়ার ঝটকায় উড়ে যাওয়া চুলগুলোকে সামলে খানিকটা তফাতে সরে গিয়ে মহিমা বলল, এবার তোমরা কোন বিচিত্রানুষ্ঠান করছ না?

প্রসঙ্গ পরিবর্তনে একটু খুশিই হল যেন টিটো। বলল, পুজোর এ কটা দিন প্রতি সন্ধেতেই বড় বড় শিল্পীরা আসছেন। তুমি যাবে?

মহিমা একটু ভারি গলায় বলল, তুমি তো আমায় কোথাও নিয়ে যাওনা!

টিটো একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, তোমার পড়াশোনার ক্ষতি হবে ভেবেই অ্যাদ্দিন যাইনি। তাছাড়া কাকা-কাকিমা ভাবতে পারেন, তোমায় আস্কারা দিচ্ছি।

— আমাদের বাড়িতে পুজোর দিনগুলোতে কাউকেই কিছু বলা হয়না সেটা জান? পড়াশোনা সময়মত করে নিলেই হল। সারাদিন তো আর কেউ ঠাকুর আর ফাংশান করে বেড়ায় না!

— তাহলে আজই চলনা কেন? খানিকক্ষণ ঠাকুর দেখে নিয়ে একেবারে আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা হয়ে আসবে।

— না, আজ না। আবারও কেমন গম্ভীর হয়ে গেল মহিমার গলা। বলল, কালও হবে না। কাল মা-বাবার সঙ্গে বেলুড় মঠে যাব। একদম ভোরবেলা। ওখানে এক কাকার বাড়ি কাছাকাছি। বাবার এক লেখক বন্ধু। সেখানে সপ্তমী কাটিয়ে রাত্রি করে বাড়ি ফেরাটা আমার ছোটবেলার অভ্যাস। বরং অষ্টমীর দিন অঞ্জলী দেবার পর বেরোই।

মনে মনে একটু ক্ষুন্ন হলেও কিছু বলল না টিটো। আজ তাদের কথাবার্তার সুর বারবার কেটে যাচ্ছে। টিটোর মনে হল, এখনও সে মহিমার অতি ব্যক্তিগত জীবনের কোনখানে এতটুকুও ছাপ ফেলতে পারেনি। কেমন শূন্য মনে হল নিজেকে তার। অনেকটা যেন তার মনোভাব বুঝতে পেরেই মহিমা বলল, অঞ্জলিটা কিন্তু তোমাদের মন্ডপে গিয়েই দেব। নিয়ে যাবার দরকার নেই। ঐ সময়টা মা, মাসিদের কেউ না কেউ থাকবেই। তুমি বরং সাড়ে আটটা নাগাদ পৌঁছে যেও।

এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল টিটোর মুখে। মহিমার দিকে না তাকিয়েই সে বলল, আচ্ছা।

ছাদের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল টিটো। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দরজার পাশ থেকে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহিমা। মুখখানা অল্প আলোয় ভীষণ বিষন্ন দেখাচ্ছে।

জলসার হুল্লোড়ে পরপর তিন রাত ঘুম হয়নি টিটোর। প্রায় ভোররাত অবধি একাধারে শিল্পী আর দর্শক-শ্রোতাদের ঠেলা সামলাতেই চলে গেছে। পাঁচটার সময় মেসে ফিরে নিজেকে বিছানায় ছুঁড়ে দিতে

দিতেই গভীর ঘুম। তাই আজ যখন আটটায় হঠাৎই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল তখন নিজেরই অবাক লাগল ওর। চোখের সামনে দেয়ালে লটকানো বাংলা তারিখে গোল দাগটা দেখে একলাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ও। মহিমা নিশ্চয়ই এতক্ষণে পৌঁছে গেছে!

মিনিট কুড়ি-পঁচিশের ভেতর স্নান, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে যখন রাস্তায় নেমে এল তখন টিটোর শরীরের সমস্ত অবসাদ কেটে গেছে।

সারি সারি হোটেল, মণিহারী জিনিসের দোকান পেছনে ফেলে দৌড় লাগাল টিটো। মেস থেকে প্যান্ডেলের দূরত্ব বেশি নয়। একটু বাদেই পৌঁছে গেল ও।

বড় রাস্তা থেকে সরাসরি ঢুকে যাওয়া চওড়া প্রথম লেনটা আটকেই পুজোটা হচ্ছে। তবে প্যান্ডেলটা এমন জায়গায় করা হয়েছে যাতে দু'দিক থেকেই মানুষজন এসে প্রতিমা দর্শন করতে পারে। যদিও গাড়ি, ঘোড়া আসা যাওয়ার রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ। প্যান্ডেলের গা ঘেঁষে আরেকটা স্টেজ করা হয়েছে। এখানেই পুজোর কদিনের যাবতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। টিটো দেখল, মেয়েদের ভিড়ে থিক্‌থিক্‌ করছে জায়গাটা। কোনমতে সকলকে কাটিয়ে মাতৃমূর্তির কিছুটা সামনে অঞ্জলি দেবার জায়গাটায় এসে উপস্থিত হল টিটো। তার ঠিক হাত খানেক তফাতেই দাঁড়িয়ে আছে মহিমা আর ওর মা। মহিমা চোরাচোখে এদিক ওদিক দেখছে। খুব দায়িত্ববান পুরুষের মত এগিয়ে এসে রজত মেয়েদের হাতে হাতে সাহায্য করে চলেছে। দেখেই গা জ্বলে গেল টিটোর। হেমবুড়িকে পোড়ানোর দিনকতক পর রজতের সঙ্গে মহিমাদের আলাপ করিয়ে দেওয়াটাই কাল হয়েছিল। এখন, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা কতদূরে গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে! এতক্ষণের ফুরফুরে মেজাজটা এক নিমেষে যেন বিষাক্ত হয়ে উঠল টিটোর।

মহিমার আগেই তার মা টিটোকে লক্ষ্য করেছেন। হাতের খালি থালাটা দিয়েই মেয়ের কনুইয়ে একটা খোঁচা দিলেন। মহিমা ফিরে তাকাতেই টিটোর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। স্নিগ্ধ হেসে সে বলল,

কখন এলে? আমি একদম দেখতে পাইনি!

মহিমার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছিল না টিটো। লালপেড়ে দুধসাদা গরদের শাড়ি আর সামান্য চন্দনের একটা টিপে কোন মেয়ের যে এতখানি পরিবর্তন হতে পারে, না দেখলে যেন বিশ্বাসই করা যায় না। এলোমেলো হাওয়ায় শ্যাম্পু করা পিঠ ছাপানো চুলগুলো উড়ছে। তাতেই আরো মারাত্মক সুন্দর মনে হচ্ছে মহিমাকে।

কোন প্রাকৃতিক বিস্ময়ের মুখোমুখি হলে মানুষ হঠাৎই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তেমনই দেখাচ্ছিল বোধহয় টিটোকে। মহিমাকে কানে কানে কিছু বলে তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে ওর মা যখন প্যান্ডেল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তখনই সম্বিত ফিরল টিটোর। ভীষণ লজ্জা পেল সে।

মহিমা টিটোর হাতে একটা চিমটি কেটে প্যান্ডেলের ঘেরাটোপের বাইরে নিয়ে এসেই বলল, কি যে সমস্ত করনা, সকলের সামনে লজ্জায় পড়ে যেতে হয়! ও'রম হাঁ করে দেখছিলে কেন?

টিটো মুগ্ধভাবে বলল, তোমাকে মনে হচ্ছে বনলতা সেন।

মহিমা বলল, যাঃ। আমি কিছুতেই জীবনানন্দের কল্পনা হতে পারি না।

টিটো বলল, সত্যি বলছি। আজকের মত সুন্দর তোমাকে কোনদিনও মনে হয়নি।

মহিমা টিটোর চোখে চোখ রাখল। বলল, আমি তো কিছুই নই। এর চেয়ে সুন্দর আর কারো সঙ্গে আলাপ হলে তুমি নিশ্চই তাকেও এ'রম বলবে।

মহিমার কথাগুলোয় বিষাদের সুর এমন স্পষ্ট যে মুহূর্তের জন্য টিটোর মনে হল সে তার স্বাভাবিক সপ্রতিভতা হারাচ্ছে। নিজের অজান্তেই তার চোখদুটো ঘুরে গেল রজতের দিকে। পাড়ার মার্কামারা দুটো ছেলের

সঙ্গে কথা বলছে রজত আর মাঝে মাঝে চোখ সরু করে তাদের দিকে দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই ও এমনভাবে হাসল যে টিটোর মনে হল হাসিটা চেষ্টাকৃত। ওরা নিশ্চই তাকে আর মহিমাকে নিয়েই আলোচনা করছে। ভ্রু কুঁচকে উঠল টিটোর; চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

মহিমা মাতৃমূর্তির দিকে তাকিয়েছিল। মুখ ফিরিয়ে টিটোকে বলল, এবার চল। মাকে বলা আছে ....

টিটো বলল, দুপুরে ফিরব না বলে দিয়েছ তো? তাহলে সাউথটা শেষ করে ধর্মতলায় কোথাও খেয়ে নিয়ে গ্লোবে ঢুকে যাব।

মহিমা টিটোকে নিয়ে গলি ধরে কলেজস্ট্রীটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, না। পুজোর দিন কোন সিনেমা না। তাছাড়া এ ধরণের আনন্দ থেকে তুমিই তো আমাকে এ সময় দূরে থাকতে বলেছ।

মহিমার কথায় সায় দিয়ে হেঁটে চলল টিটো। বলল, রজত বা আমাদের ক্লাবের কেউ তোমাকে কিছু বলছিল?

—হ্যাঁ, অনেক কিছু। আজ তো সার্বজনীন সুযোগের দিন। কেউ মাকে 'কাকিমা' ডেকে, কেউ আমাকে 'বোন' পর্যন্ত বলে দিব্যি আলাপ করে নিল। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং কি জান, অনেকেই তোমার খোঁজখবর আমার কাছ থেকেই নিচ্ছিল। তুমি যেন আমারই সম্পত্তি। একজন আবার বলল, রঞ্জা কাকিমা না কে যেন একজন তোমাকে ডেকেছেন। জরুরী দরকার, যেন বলে দিই।

অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে স্বাভাবিক করতে পারল না টিটো। একটু রুক্ষ গলায় বলল, রঞ্জা কাকিমা রজতের মা। কেন ডেকেছেন বলেনি? বোধহয় ইয়ে ......

—রজতদার মা! মহিমা একটু থমকে গেল। বলল, একটা কথা এ প্রসঙ্গে আমার মনে হচ্ছে। বোধহয় তোমাকে বলা উচিত। তুমি কি আমার পিসির কথা জান?

—না, কে বলত?

—বিনতা প্রোডাকশন্‌সের ব্যানারে এই যে সব বাংলা ছবি, সিরিয়াল হচ্ছে তারই প্রোপাইটার আমার পিসি। পুরো নাম বিনতা রায়চৌধুরী। খুব শক্ত প্রকৃতির মহিলা। বাবার একমাত্র বোন এবং খুবই আদরের। পিসি আবার আমার মায়ের স্কুল পর্যায়ের বান্ধবী। 'তা পরশুদিন এসে এখানকারই এক মহিলা সম্বন্ধে অনেককিছুই উনি মাকে বলে গেছেন। এখন বুঝতে পারছি রজতদার মা-ই সেই মহিলা। ওদের পদবী যে দত্ত সেটা তো আগে জানতাম না।

উৎকণ্ঠা চাপতে পারছিল না টিটো। বলল, আসল ব্যাপারটা কি বলনা?

মহিমা স্বাভাবিকভাবেই বলল, অনেকদিন আগে বাবা নাকি জিতু গোস্বামী.... মানে, ফেমাস চিত্রনাট্যকার হয়ে উঠেছেন যিনি, ওঁকেই অনেকবছর আগে পিসির কাছে পাঠিয়েছিলেন। ওখান থেকেই ভদ্রলোকের যাবতীয় নাম-যশের শুরু। সত্যিকারের সিনসিয়ার লোক অবশ্য। কিন্তু, মাস ছয়েক আগে রজতদার মা, মানে রঞ্জাবতী দত্তকে নিয়ে উনি পিসির কাছে হাজির হন। আর তারপর থেকেই ঝামেলা। মহিলা নাকি জিতুবাবুর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এমন সব কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছেন যে পিসির রেপুটেশানের খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। অথচ, মহিলার নাকি এমনই ক্ষমতা যে কেউই তার হাত থেকে বেরোতে পারেনা। আমি ছিলাম বলে পিসি সরাসরি অনেক কিছুই বলেনি। কিন্তু, ইঙ্গিত দিয়েছেন এই বলে যে, ভদ্রমহিলা নাকি অসম্ভব নোংরা। বিগত কয়েকমাসে এইসব থেকেই লাখ লাখ টাকা কামিয়ে নিয়েছেন। আবার মজা দেখ, যে অভিনয়ের জন্য ওনাকে পিসির কাছে নিয়ে যাওয়া তাতে নাকি আবার ষোল আনার ওপর আঠের আনা দড়। এইতো কালকের কাগজেই ছবি দিয়ে ওনার সম্বন্ধে অ্যাতখানি লিখেছে!

টিটো আর শুনতে পারছিল না। একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, তা আমার সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক? আমি তো কেবল ওনার ছেলের বন্ধু।

আর কোথায় ওনার পাবলিসিটি হচ্ছে, কোথায় উনি অসভ্যতা করে বেড়াচ্ছেন এসবের হিসেব রাখা তো আমার কাজ নয়—

—আহা! তা নয়। এই ধরণের মহিলারা তাদের পারিপার্শ্বিকতাকে ওদেরই মত করে রাখেন কিনা! কোন ভদ্র ছেলের পক্ষে কি সেখানে যাওয়া ভাল? তাছাড়া, অত ছেলে ফেলে রেখে বেছে বেছে তোমাকেই বা ডাকছেন কেন? আমার মনেহয়, তোমার ওখানে না যাওয়াটাই ভাল হবে গো। বিশেষত মা, বাবা জানতে পারলে—

মনে মনে রঞ্জাবতীর মুন্ডপাত করল টিটো। এখন ছবিটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সেই দিনটার ভুল যে এখানে, এতদূর পর্যন্ত গড়িয়ে এসে মহিমাকে ছুঁইছুঁই করবে এতটা সে আন্দাজ করতে পারেনি। মনের ভাব চেপে রেখে সরলভাবে সে মহিমাকে বলল, তুমি যা বললে এসব তো আমি কল্পনাও করতে পারিনা। ঠিক আছে। কোনদিনও আর ওখানে যাবনা। তাতে যদি রজতের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিতে হয় সে'ও ভি আচ্ছা।

এ ক'দিনের মানসিক ভার যেন একলহমায় কেটে গেল মহিমার। উৎফুল্লভাবে সে বলল, কথা দিলে কিন্তু। এবার চল, পায়ের নীচে কলকাতাটাকে দলে পিষে ফেলি।

টিটো তার হাত ধরে বলল, তুমি কবিতা লিখতে পারতে। আমি না হয় ঘুরে ঘুরে মাথায় করে তোমার বই-ই বেচতাম। যেমন সমরেশ বসু 'শ্রীমতি কাফে' নিয়ে —

মহিমা বলল, আমার জন্য অতখানি কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠনা। খুবই সাধারণ মেয়ে আমি যার একমাত্র স্বপ্ন সে টিটো চ্যাটার্জীর বউ হবে।

মহিমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কথাও বলতে পারল না টিটো।

রেস্তোরাঁর আলো আঁধারির মাঝখানে আরো অনেক জোড়া মানুষ-মানুষীর মত রঞ্জার সঙ্গে একখানা টেবিল ভাগাভাগি করে বসে সিঁড়িভাঙা

অঙ্ক কষছিল জিতু। সিঁড়ির প্রথম ধাপে বিনতাকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল আর একদম শেষের ধাপে যশদেও খিলানীকে। আপাততঃ যশদেওকে পেড়ে ফেলাটাই তার লক্ষ্য। অর্থাৎ অঙ্কের শেষটা তার জানা। কেবল পুরোপুরি কষে ফেলাটাই বাকি রয়ে গেছে।

টেবিলের ওপর সার্দান কমফোর্টের আস্ত একখানা বোতল বসান। আধাআধি মত শেষ হয়েছে। প্রচুর স্যালাড আর মাংসের স্টেকসহ বেশির ভাগটাই উড়িয়ে দিয়েছে রঞ্জা। ওর ক্ষমতা দেখে বরাবরের মতই অবাক হয়েছে জিতু।

পূর্বাশা হেলথ্ ক্লাবে এখন নিয়মিতই আসে রঞ্জা। ঘন্টাখানেক সময় এখানকার অত্যাধুনিক শরীরচর্চার উপযোগী যন্ত্রপাতিগুলোর সঙ্গে যেন যুদ্ধ করে। স্বল্পবাস নারী-পুরুষেরা এখানে একসঙ্গে ব্যায়াম করতে আসে। স্বভাবতই রঞ্জার সঙ্গে থাকায় জিতুকেও অল্পস্বল্প চেষ্টা করতে হয়। জীবনেও ব্যায়াম করেনি সে। একটুতেই তার দম যেন বেরিয়ে যায়। উল্টোদিকে হয়ত এখন ঝড়ের গতিতে প্যাডলিং করতে করতে বিন্ বিন্ করে ঘামছে রঞ্জা। চাপা স্ল্যাক্স আর বক্ষবন্ধনী যেন ফেটে বেরোতে চায়। তবুও থামেনা মেয়েটা। ঐ একটা ঘন্টা জীবনপণ সংগ্রাম করার পর সোজা বিকিনি পরে নেমে যায় ক্লাবের সুইমিংপুলে। আধ ঘন্টাটাক সাঁতার কেটে পুল থেকে উঠে ক্লোকরুমে ঢুকে যায়। যখন সেখান থেকে সে বেরিয়ে আসে তখন তাকে চল্লিশোর্ধ কোন মহিলা বলে মনেই হয়না। মনেহয়, বড়জোর ছাব্বিশ কি সাতাশ বছরের মডেলসুলভ চেহারার কোন মেয়ে অন্যের চোখে নিজেকে যাচাই করতে বেরিয়েছে।

জিতুর নিজের পছন্দ কেবল সওনা বাথ। সামান্য ব্যায়ামের পরিশ্রমেই কাহিল হয়ে সেটাই নিতে হয় তাকে। সপ্তাহে যে দুদিন রঞ্জার সঙ্গে যে এখানে আসে তাতে এই নিয়মের কোন তফাৎ হয়না।

ভি আই পি রোডের গায় নবনির্মিত একটা কংক্রীটের জঙ্গলের ভেতর এই হেলথ ক্লাব। রেস্তোঁরাটিও এরই একটা অংশ। শহরের বহু

ভাগ্যবান মানুষেরও এখানে আসার সুযোগ হয়ে ওঠেনা। ক্লাবের নিয়মকানুনই এ রকম। এই রেস্তোঁরাও ক্লাবেরই সম্পত্তি। তার আবার হরেক মজা। যতই রাত বাড়ে ততই বিচিত্র সমস্ত জগতের দরজা খুলে যায় এখানে।

মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে টেবিলের নীচ দিয়ে নিজের ডান পায়ের হাই হিলখানা জিতুর পায়ের পাতার ওপর বসিয়ে একটু মোচড় দিয়ে গাঢ় গলায় রঞ্জা বলল, কি হল? তোমার খিলানী কি অন্য মেয়েমানুষের কাছে চলে গেল নাকি?

জিতু চারদিকের পরিস্থিতি যাচাই করে চোরের মত বলল, একটু আস্তে। এখুনি চলে আসবে। খুব পাংচুয়াল লোক। ওই তো —

রঞ্জার পেছনদিক থেকে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক। বয়স কম করেও ষাট। লম্বা, দোহারা চেহারা। গায়ের ফর্সা রঙের সঙ্গে মানানসই ঘিয়ে রঙের পাতলা চুল আর রিমলেস চশমা। ট্রাউজার আর ঢিলে বিদেশী টি শার্টে তাকে মানিয়েছেও চমৎকার। রঞ্জাদের টেবিলের কাছে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তিনি বসলেন। রঞ্জা গেলাস রেখে ডান হাত বাড়িয়ে মৃদু পেশাদারী চাপ দিল তার হাতে।

জিতু ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত উত্তেজিত উঠছিল। যশদেও খিলানীর মত নামী হিন্দি ছবির প্রযোজককে আজ সন্ধেয় একলা গাঁথবার জন্য অ্যাদ্দিন কত চারই যে জিতুকে ফেলতে হয়েছে তার ইয়ত্তা সেই। সবথেকে অসুবিধা ছিল বিনতার চোখ এড়িয়ে যশদেওকে কয়েক ঘন্টার জন্য সরিয়ে ফেলা। আপাতত খেলাটায় সফল জিতু। কিন্তু, বিনতা বোকা নন। জিতুর বিশ্বাস, কয়েক ঘন্টার ভেতরেই তার মাইনে করা কোন আড়কাঠি আসল খবরটা তার কাছে পৌঁছে দেবে। সবচেয়ে ভয় জিতুর নিজেরই প্রিয় সমস্ত প্রেসের লোকদের। কে যে কোথায় ঘাপটি মেরে বসে থেকে উপকারের মুখোশে আছোলা বাঁশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে কেউ বলতেই পারবে না।

যশদেওকে ভাল করে দেখে রঞ্জার মতই রসস্থ মনে হল জিতুর। অগত্যা আর সময় নষ্ট না করে দুজনকে নিয়েই উঠে দাঁড়াল জিতু। এই ফাঁকটুকুতে রঞ্জাকে সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে যেন উপভোগ করছিলেন যশদেও। জিতুর পেছন পেছন যেতে স্খলিত গলায় বললেন, আপকা কন্ট্রাক্ট পেপার রেডি হ্যায়। সির্ফ বিন্‌তাকো কুছ পতা নেহি হোনা চাহিয়ে। বাদমে মেরা সেক্রেটারী উসে সামহাল লেগা।

এই অবস্থাতেও যশদেও বিনতা-আতঙ্কে ভুগছেন দেখে অবাক লাগল জিতুর। বিনতা কোটি কোটি টাকার মালিক, বিনতা বহু ভিখিরিকে লাখোপতি বহু লাখোপতিকে ভিখিরি বানিয়ে ছেড়েছেন প্রভৃতি তথ্য জানা থাকলেও এই দশ বছরে কখনও তাকে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়নি জিতুর। তবুও একধরনের অপরাধবোধে বুকের ভেতরটা যেন কেঁপে উঠল তার। বিনতা চাইলে তাকে একদিনে স্বপ্নসৌধ থেকে তুলে নিয়ে মাটির পৃথিবীতে আছড়ে ফেলতে কিংবা সোজা কবরে পাঠিয়ে দিতে পারেন!

পুল-সংলগ্ন একখানা কেবিনের দরজা খুলে রঞ্জা আর যশদেওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবার সময় পুঞ্জীভূত অসোয়াস্তি একদম ছেয়ে ফেলল জিতুকে। সেই মুহূর্তেই বন্ধ দরজাটা হাট করে খুলে ধরে নিজের এক চিলতে ব্রা খানা তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল রঞ্জা।

বিশুর কাছ থেকে রজতের ফ্ল্যাট বিক্রির ইতিহাসটা শুনে নিল টিটো। ডিসেম্বরের প্রথম রবিবারে মধ্যমগ্রামের বাদু নামের এই অঞ্চলটায় পিকনিকে এসেছে ওরা ক্লাবেরই কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। চাকরীটা পেয়ে গিয়েছে টিটো। অতএব, মেস ছাড়ার দিনটা ক্রমশই ঘনিয়ে আসছে তার জীবনে। সে জন্যই বোধহয় এবার একটু তাড়াহুড়ো করে পিকনিকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে, রজত আসেনি। ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্কটা ঝুলিয়ে রেখে বিরাটিতে ওর মায়ের কেনা বাগানবাড়িখানায় হঠাৎই চলে গেছে ও। মধ্য কলকাতার বাড়ির একতলার ফ্ল্যাটখানা বেচে যে টাকা ও পেয়েছে তাতেই দু'পুরুষ খেয়ে শেষ করতে পারবে না রজত। একের পর এক গুট্‌খার প্যাকেট মুখের ভেতর খালি করতে করতে খুব বিষন্নভাবে

রজতের সৌভাগ্যের কথা বলছিল বিশু। টিটোর মনে হচ্ছিল, এমন একটা সুযোগের জন্যই যেন এতদিন মুখ বুজে অপেক্ষা করে আসছিল রজত। সে হিসেব করে দেখেছে, এরপর আর ওদের পক্ষে পাড়ায় থাকা মুশকিল হয়ে যাবে।

সত্যিই ভীষণ বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছিলেন রঞ্জা। বারবার টিটোকে ডেকে পাঠানো সত্ত্বেও সে না যাওয়ায় কেমন করে খবর নিয়ে টেস্ট পরীক্ষা চলাকালীন একদিন মহিমাকেও রাস্তার মধ্যে ধরেছিলেন। ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছিল টিটো নিজেও তা বলতে পারবেনা। তবে, সেদিন সন্ধ্যায় নিজেদের বাড়ির ছাদে নিয়ে গিয়ে তার বুকের ওপর মাথা রেখে হাউহাউ করে কেঁদেছিল মহিমা। ফোঁপানি আর কান্না মেশানো বিকৃত গলায় বলেছিল, ঐ ডাইনীটা তোমার চরম ক্ষতি করে দেবে বলছে। কেন? কেন এমন বলছে ও?

হিস্টিরিয়াগ্রস্থ রোগীর মত অবস্থা তখন মহিমার। নিপুণ প্রেমিকের ভঙ্গিতে তাকে শান্ত করে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে মিথ্যের পাহাড় তৈরি করেছিল টিটো। বলেছিল, রজতরা অন্যায়ভাবে অন্যের ফ্ল্যাট দখল করে রেখেছে বলে যিনি আসল ফ্ল্যাট-মালিক তিনি এসে ওদের ক্লাবের ছেলেদের অনুরোধ করেছেন যেন ফ্ল্যাটটা খালি করে ওরা তাকে সাহায্য করে। ভদ্রলোক নিজে বিকলাঙ্গ। স্ত্রী-সহ দুই সন্তানের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু শারীরিক ত্রুটি আছে। এহেন এক অসহায় পরিবারকে বছরের পর বছর রজত, বিশেষ করে তার মা রঞ্জাদেবী যে অন্যায় পদ্ধতিতে বঞ্চিত করে রেখেছেন তাতে ভদ্রলোকের ধারণা হয়েছে, এ জন্মে আর তাদের সুবিচার পাবার আশা নেই। আবার মামলা-মোকদ্দমা করে যে এগোবেন সে রকম টাকার জোরও নেই।

এত কথায় খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল মহিমা। টিটোর আবেগ ছুঁয়েছিল তাকেও। সে বলেছিল, এই ব্যাপার! আসলে তুমি ওদের বিরুদ্ধপক্ষ নিয়েছ বলেই ওনার এত রাগ! আর আমি ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম —

—আমার মনে হয় আমাকে দেখে নেবেন বলেই উনি চলে গিয়েছিলেন, কেমন কিনা?

—হ্যাঁ। উনি প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন। তোমার বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন। তারপর নিজের গাড়িখানা চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

—ঠিক এটাই আমি আন্দাজ করেছি। টিটো অনেকটা চিন্তামুক্তভাবে কথাটা বলল। আরো বলতে ছাড়ল না, তুমি একটু খুঁচিয়ে দেখতে পারতে। তাহলে—

—মাফ্ কর। ফোঁস করে উঠেছিল মহিমা। বলেছিল, আমার কেমন গা ঘিন্ঘিন্ করছিল। কথাবার্তার ভঙ্গিটা বড় বিশ্রী ভদ্রমহিলার।

টিটোর সামনে কিছুদিন আগের বৃষ্টিমুখর একটা রাত পাক খেয়ে গিয়েছিল। স্তিমিত গলায় সে বলেছিল, এ কথাটা আমারও কয়েকবার মনে হয়েছে। কিন্তু, তোমার কথামত ওদের টোট্যালি অ্যাভয়েড করে চলি বলে কিছু নিয়েই আর মাথা ঘামাই না। নেহাৎ এই লোকটা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড্.........

—ঠিক আছে। আমার আর শুনে কাজ নেই। হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে মহিমা বলে উঠল, পরীক্ষা না চললে তোমার সঙ্গে আর একটু বসতে পারতাম। কিন্তু তুমি যখন আমার রেজাল্টের ব্যাপারে এতটা জোর দিচ্ছ........

এর পর আর বসে থাকার কোন মানে খুঁজে পায়নি টিটো। সামান্য একটু ভুল খেলাই মহিমার পক্ষে অনেকটা বেশি হয়ে দাঁড়ায়, এই অভিজ্ঞতা থেকে আর কথা বাড়ায়নি টিটো। কাকিমা অর্থাৎ মহিমার মায়ের সঙ্গে দেখা না করেই সে সেদিন বেরিয়ে এসেছিল।

পরপর দু'খানা রামের পাঁইট শেষ করে ব্যোম্ হয়ে বসেছিল বিশু। বিড়বিড় করে টিটোকে সে বলছিল, গাঁজার দানা খাওয়া মুরগি দেখেছিস?

কেমন মেপে মেপে পা ফেলে! রজতকে সেদিন সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে দেখলাম। ঠিক ঐভাবেই হাঁটছে। এত কাঁচা পয়সা! এগুলো থেকে এই-ই হয়।

খোলা মাঠের মাঝখানে বসে আছে ওরা। উত্তুরে বাতাসের কামড় বাড়ছে। পেটে মদ না থাকলে জ্যাকেটের আরেকটু তুলে দিত টিটো।

মাঠের একদিকে রাস্তা ঘেঁষে ওদের ম্যাটাডোরখানা দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য ছেলেরা রান্নার হাঁড়িকড়া, টেপ রেকর্ডার, ক্রিকেট ব্যাট-উইকেট জাতীয় জিনিসগুলো এক এক করে তাতে তুলে দিচ্ছে। টিটোর মনে পড়ল, কয়েকমাস আগে হেমবুড়িকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার দিনটাতে এই ম্যাটাডোরখানাই তারা নিয়ে গিয়েছিল। কি অদ্ভুত এই প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন!

টলমল করে উঠে দাঁড়াল বিশু। টিটোও উঠল। বিশুকে একটু সাহায্য করতে হল। এর আগে ওকে অনেক বেশি মদ টিটো খেতে দেখেছে। কিন্তু, আজ বোধহয় ওরও কোথাও গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে চাঁদের আলোর আভায় বিশুকে করুণ এক ভেঙে পড়া মানুষের মত দেখাচ্ছিল। টিটোর দিকে তাকিয়ে যেন অনেক কষ্টে সে বলল, এভাবে বছরের পর বছর পিকনিক করে বেড়াই ...... কি পাই কে জানে! কোনবার ডাবু, কোনবার পিয়ালী কখনও গাদিয়ারা .... প্রতিবারই একজন, দুজন করে বন্ধু খসে যায়। এবার তুইও যাবি। চাকরী পেয়েছিস, তুই তো আরো আগে যাবি। আমিই কেবল থেকে যাব।

কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি খুব চালু একখানা আধুনিক রেঁস্তোরার মালিক বিশু। বন্ধুবিচ্ছেদ অথবা জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা নিয়ে তার এই হাহাকারের সঙ্গে টিটোদের কম দিনের পরিচয় নয়। তবুও আজ, এই

সন্ধ্যায় বিশুর কথাগুলোয় অন্যরকমের সুর। আকুতিটুকু টিটোকে ছুঁয়ে গেল।

ম্যাটাডোর একসময় চলতে চলতে ভি আই পি রোডে উঠে এল। কোনার একটা দিকে আধশোয়া হয়ে পড়েছিল বিশু। সেই অবস্থার ভেতরই টিটোকে সে জিজ্ঞেস করল, এবার নিশ্চয়ই বিয়ে করবি?

—স্বাভাবিক। টিটো না বলে পারল না।

—এরপরে স্বাভাবিকভাবেই তোর একটা বাচ্চা হবে।

কথাটা বলেই যেন গভীর ঘুমের ভেতর তলিয়ে গেল বিশু।

জিতু গোস্বামী আবারও মুম্বই চলল। এবার আর ব্যর্থতার দায়ভার নিতে নয়, দস্তুরমত দু'দুটো সুপারহিট ছবির চিত্রনাট্যকার হিসেবে একটা জনপ্রিয় ফিল্মি সাপ্তাহিক পত্রিকা আর একখানা বিখ্যাত সাবান কোম্পানী ঘোষিত পুরস্কার পাবার জন্য। সপ্তাহ দু'এক আগে থেকেই ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার কাগজে জিতুর এই একসঙ্গে দু'দুখানা পুরস্কার পাবার খবর নিয়ে অনেক ঢাকঢোল পেটানো হয়েছে। টেলিমিডিয়ার তো কথাই নেই। দিনে কতবার করে যে এরা এই ধরণের পুরস্কারগুলো নিয়ে প্রচার করে বেড়ায় সম্ভবত এরা নিজেরাই জানে না। জিতু নিজে অবশ্য পুরস্কার-টুরস্কার নিয়ে তেমন ভাবিত নয়। সমস্ত সার্থক শিল্পীর মতই সে সাফল্যকে তাড়াতাড়ি ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চায়।

তার আজকের এই সাফল্যের পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি সেই রঞ্জা এখন লেক প্লেসে তারই সঙ্গে বিরাট একখানা মাঠের মত ফ্ল্যাট শেয়ার করে থাকে। তার প্রতিদিনের কাজের পেছনে থাকে রঞ্জার একেবারে নিজস্ব ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন। অনেকসময় জিতুর মনে হয় সে আসলে এক ছায়ামানুষ, প্রকৃত অবয়বটা যেখানে রঞ্জার।

রঞ্জার এক ছেলে আছে, জিতু জানে। তবে, তাকে দেখার কোন ইচ্ছে এ ক'মাসের মধ্যে কোনদিনও হয়নি জিতুর বা রঞ্জাও কোনদিন

নিজের ছেলেকে তার সামনে আনে নি। অবশ্য ছেলেপুলেদের জনসমক্ষে না আনার ট্রেন্ডটা একা রঞ্জার নয়। বহু কালজয়ী অভিনেত্রীই যুগে যুগে এই কাজ করে এসেছেন। এসব না করলে নাকি ফ্যানেদের কাছে বয়স লুকোনো যায়না!

জিতুর সঙ্গে একই অ্যাপার্টমেন্টে বাস করলেও আজ পর্যন্ত তার সম্বন্ধে কোন শারীরিক উৎসাহ দেখায়নি রঞ্জা। তার কেবল মনেহয়, সে একটু দুর্বল প্রকৃতির বলেই তার সঙ্গে বিপরীত মেরুর রঞ্জার খাপ খেয়ে গেছে। রঞ্জা বলে, তাকে শাসন করার মত একজন পুরুষকেই নাকি সে পেয়েছিল। কিন্তু, তার বয়স এতই কম যে তার সঙ্গে ঘর বাঁধা যায়না। এতখানি অবাক জিতু কোনদিনও হয়নি যতটা রঞ্জার মুখে একথা শোনার পর সে হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও অবশ্য ভাগ্যবান সেই পুরুষটির নাম আবিষ্কার করতে পারেনি ও। এই প্রসঙ্গ এলেই মুখে কুলুপ এঁটে থাকে রঞ্জা। বলে, ছেলেটির সঙ্গে তার সম্পর্ক মাত্র একটা রাতের। ব্যস্, এর অতিরিক্ত একটা কথাও বলেনা। তবুও জিতুর মনেহয়, আদ্যন্ত বস্তুবাদী রঞ্জা তার এই সম্পর্কটুকুর ব্যাপারে একদম রোম্যান্টিক।

তার আগামী ছবির সদ্য শুরু করা চিত্রনাট্যে অসাধারণ এব নারীচরিত্র রাখছে জিতু —অনেকটা রঞ্জার আদলে। চরিত্রটা বহুমুখী। রঞ্জার স্বপ্নের পুরুষটিকে সে এঁকেছে সম্পূর্ণ তার কল্পনার রঙে। তার চিত্রনাট্যে ছেলেটির এক প্রেমিকা আছে। সে মানসিকভাবে নিঃসঙ্গ। এ যুগে বিরল এমন এক ধরণের প্রেম সে তার প্রেমিক সম্বন্ধে পোষণ করে। পৃথিবীর যাবতীয় কুশ্রীতা থেকে তাকে সে রক্ষা করতে চায়। এজন্য নানাভাবে তাকে বিব্রত ও অপমানিত হতে হয়। তবুও, কোনভাবে নিজের নিষ্কলুষ প্রেমকে সে একেবারেই সেলুলয়েডের উপযোগী অবিশ্বাস্য এক উচ্চতায় নিয়ে যায়। খসড়াটা সে যেভাবে করে রেখেছে তাতে ঠিক এই জায়গায় কাহিনীর নায়িকা অথবা মেয়েটিকে তার ক্যান্সার অথবা থ্যালাসেমিয়ার মত দুরারোগ্য কোন অসুখ উপহার দেবার ইচ্ছে। তহালেই নির্ঘাৎ ছবি হিট।

এবারকার পুরস্কারগুলো নেবার সময় স্টেজের ওপর তার যে বিশেষ অনুভূতি জন্ম নেবে সে সব বিশ্লেষণ করেই গল্পের শেষ মোচড় মানে মোক্ষম জায়গাটুকু তৈরি করবে জিতু। এমনও হতে পারে যে অসুস্থ নায়িকা বিখ্যাত কোন মঞ্চে ততোধিক বিখ্যাত কোন পুরস্কার হাতে তুলে নেবার মুহূর্তেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। এর জন্য অবশ্য ওকে কিংবদন্তীতুল্য কোন গুণের অধিকারিণী করে তুলতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় মেয়েটি যদি গায়িকা হয়। তাহলে ছবিতে গানের স্কোপটা বেড়ে যাবে। যশদেও খিলানীর সঙ্গে অসীম-শুভ জুটির পরিচয় আছে। এই গল্প পেলে গোটা তিনেক হিট্ গান যে ওরা নামিয়ে ফেলবে এ ব্যাপারে নিঃসন্দিগ্ধ জিতু।

নতুন অ্যাপার্টমেন্টের লিভিংরুমের ঝাঁ চকচকে ডিভানে শুয়ে সাতপাঁচ ভাবছিল জিতু। আজ বড় বেশি করে বাবার তৈরি করা পুরানো বাড়িটার কথা তার মনে পড়ছে। গত পরশু বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে সে। ওটা যেন বিষম একটা ভার হয়ে উঠছিল তার কাছে। বাড়িটা যেন তার নিম্নবিত্ত অতীত। এছাড়া কিছুটা বিমূর্ত নস্টালজিয়াও বটে। সেটার বিনিময়ে যে এগার লাখ টাকা পাওয়া গেছে সেটুকু অবশ্য ফ্যালনা নয়। জমিকে কেন যে মানুষ মা বলে ডাকে নিজে দায়িত্ব নিয়ে জায়গাটা না বেচলে জিতু কোনদিনও বুঝতে পারতনা। এখন এই এগার লাখ টাকার সুদ থেকে একটা বাৎসরিক পুরস্কার .... নিজের বাবা-মায়ের নামে .... চালু করার কথা ভাবছে জিতু। এতে নিজের অমর হয়ে থাকার সম্ভাবনাটাও বাড়ে। তবে, সিনেমা লাইনের লোকেদের এ পুরস্কারের আশা সে দেখাবে না। দেখাবে উঠতি কবি আর গল্পকারদের। এ দলটা চিরকেলে রুগ্নতায় ভুগছে। জিতু এদের কাঁচা পয়সা দিতে চায়। ভাত দিতে চায়।

নিজেকে বুভুক্ষু লেখক জাতের পিতা হিসেবে ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল না জিতুর। এবার মুম্বাই ঘুরে এসেই ....

খুট্ শব্দ করে লিভিংরুমের দরজাটা খুলে গেল। রঞ্জা ফিরে এসেছে। ডিভানের ওপর বাবু হয়ে বসে পড়ে তার নিতম্ব দুলিয়ে চলাটুকু উপভোগ

করল জিতু। সামান্য সময়ের ব্যাপার। তারই পাশে এসে ধপ্ করে বসে পড়ল রঞ্জা। মুখখানা ভার। সম্ভবত ম্যাসাজ নেবার সময় পায়নি আজ। জমকালো কাজ করা নিকষ কালো চুড়িদারে দুরন্ত দেখাচ্ছে রঞ্জাকে। মুগ্ধভাবে কিছু বলতে চাইল জিতু। কিন্তু, তার আগেই রঞ্জা বলল, আজ চন্দ্রিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বেহেড মাতাল হয়ে তাজ থেকে বেরুচ্ছে। চেহারা এমন হয়েছে, তাকান যায়না। ওজন বোধহয় আশি কিলো ক্রশ করে গেছে। আমি কাজুরিয়াদের মীট করতে ওখানে গিয়েছিলাম, তো আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে প্রথমে কান্নাকাটি। তারপর এর ওর নাম ধরে কাঁচা খিস্তি। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। বোঝই তো, আমি যেখানে উপস্থিত সেখানে কি কি হতে পারে। প্রায় টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল ও। তা ওকে সাহায্য করতে এসে অনেকে যখন আমারও গায়ে টায়ে হাত দিয়ে ফেলল তখনই ভাবলাম, যথেষ্ট হয়েছে। এবার আমাকেই কিছু করতে হবে, নইলে যেভাবে পাবলিক প্লেসে ও কেলোর কীর্তি আরম্ভ করেছে তাতে ওর কিছু না হলেও আমাদের ইমেজের সাড়ে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কি করা যায় বলত? ওকে মুম্বাই নিয়ে যাব? মাস দুয়েকের ভেতর বাড়তি চর্বিটুকু পুড়িয়ে প্রেজেন্টেবল করে না হয় ফিরিয়ে আনা যাবে। বাদবাকিটা ওর মুখখানা দিয়েই ও ম্যানেজ করে নেবে। কি বল?

খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না জিতু। গত কয়েকবছর আঁতেল-মার্কা ছবি বেছে বেছে অভিনয় করতে গিয়ে আজ এই অবস্থা চন্দ্রিমার। পাশাপাশি ফূর্তি করেও লাখ লাখ টাকা উড়িয়েছে ও। তবে, এখনও ওর কাছে কয়েক পুরুষ বসে আয়েস করার মত পুঁজি রয়েছে। বহু বছর আগে বিনতা রায়চৌধুরীর ঘরে বসে অনেক উৎসাহ তাকে জুগিয়েছিল ও। তার প্রথম চিত্রনাট্য ঠিক ঠিক ভাবে অনুসরণ করে আশাতীত রকমের ভাল অভিনয় করেছিল। আজ তাকেই কিছু ফেরত দেবার সময় এসেছে। রঞ্জার দিকে তাকিয়ে ও বলল, তোমার এজেন্টকে বলে ওর জন্য আগামী কোনদিনের একটা টিকিট করিয়ে রাখো। ওকে না হয় আমরা ওখানেই রিসিভ করব।

— সে ঠিক আছে। কিন্তু, ওকে আবার আমাদের বাংলোয় এনে তুলো না। ও কি সেটা জানা আছে তো?

মাথাটা নামিয়ে নিল জিতু। চন্দ্রিমা যে একজন প্রতিষ্ঠিত লেসবিয়ান সে কথা বহু আগে থেকেই ও জানে। স্টুডিও পাড়ায় যশপ্রত্যাশী কয়েকটা উঠতি মেয়ের সঙ্গেই মূলত ওর কাজ কারবার। এই টাইপের মেয়েদের সঙ্গে একই ছাদের নীচে প্রাত্যহিক রাত্রিবাসের ব্যাপারটা বাস্তবিকই দুশ্চিন্তার। রঞ্জার কথাটা সেজন্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে, মুম্বাই পৌঁছলে ও কি আর সমগোত্রীয় কাউকে খুঁজে পাবেনা? ওদের তো আজকাল নানারকম ক্লাব-টাব হয়েছে বলেও শুনতে পায় জিতু। কিছুটা দুর্ভাবনাযুক্ত গলায় রঞ্জাকে সে বলল, অসীম-শুভর যে অ্যাপার্টমেন্টটা দাদারে ফাঁকা পড়ে আছে সেটাই বোধহয় ওর পক্ষে স্যুটেবল হবে। তাছাড়া, ওর পরিচিতিও তো কম নেই।

—তুমি একটা কাজ কর। বিনতাদিকে বলে কয়ে একটা গুজব প্রেসের সামনে ফেলে দাও যে, ও আগামী দিনে ওনারই কোন ছবির প্রয়োজনে ইনটেনশনালি মোটা হচ্ছে। কথাটা বলেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠল রঞ্জা আর জিতুরও অনেকগুলো অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ মনে পড়ে গেল।

আজ পরিস্থিতি এমনই যে, জিতুর সমস্ত অনুরোধই বিনতাকে রাখতে হয়, আর সেটা পুরোপুরিই ব্যবসায়িক স্বার্থে। একদিন এই জিতুই পারলে বিনতার বাড়ির বাথরুম পরিষ্কার করার মত দায়িত্ব পেলেও হয়ত বর্তে যেত।

জিতুর এই শক্ত জায়গাটা যশদেও-এর লোকজন আর রঞ্জা মিলে তৈরি করেছে। বিনতার হাতে আছে বাংলা-বাজার আর যশদেও-এর মুম্বাইয়ের। এই দুই বাজারের মাঝখানের সেতুটা রচনা করেছে রঞ্জারা। ফলে, আজ গাছেরও খাচ্ছে আর তলারও কুড়োচ্ছে সবাই। প্লাস, বিনতা বাংলাদেশের ছবি-বাজারের দরজাটাও ওদের কাছে খুলে দিয়েছেন। সেটা আরো একটা বাড়তি লাভ। লাভ, লাভ, কেবল লাভ। এছাড়া আর কিস্যু বোঝেনা জিতু।

একপলক রঞ্জার দিকে তাকাল সে। তার দিকে অসভ্যের মত পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে মাথাটা মেঝের কাছে নামিয়ে দিয়েছে রঞ্জা। হঠাৎই

জিতুর মনে হল, তাকে এতটুকুও পুরুষ বলে ভাবেনা রঞ্জা। ভাবলে কখনও এমন ভঙ্গিতে শুয়ে থাকতে পারত না। একটা দীর্ঘঃশ্বাস বেরিয়ে এল জিতুর বুকের অনেকখানি ভেতর থেকে।

জিতুকে কৌতুহলের সঙ্গে তাকিয়ে দেখছিল রঞ্জা। বলল, ফ্লাইট কটায় সেসব মাথায় রেখো কিন্তু। আমি তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে ব্যাগটা অলরেডি লফ্‌টে রেখে দিয়েছি।

জিতু শুকনো গলায় বলল, ধন্যবাদ। আকাশ ব্যাপারটা আমার চেয়ে এখনও অনেক দূরে।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা রাখতেই সোনা সোনা শীতের রোদ যেন শরীরে আদুরে হাত বুলোতে শুরু করেছে টিটোর। পেছন থেকে বেরিয়ে এসেছে সদ্য আঠেরো পেরোনো মহিমাও। কি যেন একটা পরিবর্তন এসে গেছে ওর ভেতরে। বোধহয় সদ্য-বিবাহিতা মেয়েদের ভেতর আনন্দ একটু অন্যরকমভাবে পাখনা মেলে। খুব লাজুক দেখাচ্ছে ওকে। টিটোর চোখে একটুও চোখ রাখছে না। ওর মা, বাবা আর টিটোর তরফের সাক্ষীসাবুদেরা কয়েক ঘন্টার জন্য ওদের একলা ছেড়ে গেছেন। বোধহয় এই মধুর সময়টুকু উপভোগ করার সুযোগ ওদের দুজনকে দিতে চান ওরা। বেশ সহজ মন নিয়েই ফিরে গেছেন ওরা সবাই। বিশেষ করে মন্মথ আর তার স্ত্রীকে একটু বেশিই খুশি মনে হয়েছে। টিটো আনুষ্ঠানিক বিয়ের আগেই রেজিস্ট্রি বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিল। এজন্য চাকরীতে যোগ দেবার কয়েকদিনের ভেতরেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগও নিয়ে ফেলেছিল সে। ব্যাপারটা পছন্দ হয়েছিল রায়চৌধুরী দম্পতির। পাত্র যতই মনের মত অথবা প্রতিভাবান হোক না কেন একমাত্র মেয়ের নতুন জীবনের পথে তুচ্ছতম কোন প্রতিবন্ধকতাও সহ্য হতনা ওদের। তাই টিটোর এই গোছান মনের পরিচয় পেয়ে ভেতর ভেতরেই সেরে ফেলতে চান ওরা। ওদের এই ইচ্ছেতেও বাদ সাধেনি টিটো।

মহিমা যেন ওর সঙ্গে যেচে কথা বলবে না এমন একটা পণ করে নিয়েছে। রেজিস্ট্রারার -এর সামনে কিছু বাঁধা বুলি আওড়ানোর পর সেই যে ও মুখে তালা দিয়েছে সেটা কফি হাউসের তেতলার বাঁ দিকের এই লম্বা ব্যালকনীর পরিচিত টেবিলটায় এসে বসেও আর খোলেনি। এভাবেই নীরবতা রক্ষা করে আধঘন্টাটাক সময়ের ভেতর কফি থেকে চাউমিন পর্যন্ত চালিয়ে গেল মহিমা। হাক্কার চেয়ে গ্রেভিটাই ও বেশি পছন্দ করে। এখন অবশ্য অত বাছবিচারের ভেতর না গিয়ে যন্ত্রের মত খেয়ে যাচ্ছে। টিটোও ঠিক করল, ও নিজেও যতক্ষণ পারে চুপ করে থাকবে।

ওদের দুজনের ভেতরকার ব্যাপারটা একটু পরেই হাস্যকর চেহারা নিল। কেননা, পরবর্তী পনের মিনিটের ভেতরই এমন অন্তত দশজনের সঙ্গে ওদের দেখা হল যে নিজেদের নির্বাক থাকাটা সম্ভব হয়ে উঠল না। আরো দশ মিনিটের মধ্যে একহাতে মহিমার কোমর জড়িয়ে টিটো যখন রাস্তা পার হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের দিকটায় চলে এসেছে তখন দেখা গেল সবচেয়ে বেশি কথা বলছে মহিমা আর বেশ স্বভাব বিরুদ্ধভাবেই তার একেবারে গা ঘেঁষে চলেছে সে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছনোমাত্র টিটো অনুভব করল তার হাতের ভেতরের মহিমার শরীরের যে কোমল অংশ ধরা পড়েছে সেটুকু অস্বাভাবিক রকমের উষ্ণ হয়ে উঠছে। একটু অবাক হয়েই ওর মুখোমুখি স্থির হয়ে দাঁড়াল টিটো। ওদের যৌথ জীবনের প্রথম দুপুরে এতদিনের সংযম মহিমার ঠোঁট থেকে একটা চুমু এসে টিটোর ঠোঁটে পৌঁছে যাবার জন্য যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

জনবহুল রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে সকলকে উপেক্ষা করে চুমুটা মহিমার কাছ থেকে প্রায় ডাকাতের মত ছিনিয়ে নিল টিটো। সম্ভবত কলকাতার রাস্তায় ট্রাফিক-দাঁড়-করানো চুমু এটাই প্রথম। টিটোকে অবাক করে দিয়ে কোন পুলিশ এল না, এমনকি কোন টীকা-টিপ্পনিও শোনা গেল না। সকলেই যেন আজ খুব উদার আর আধুনিক হয়ে গেছে।

মুহূর্তের হঠকারিতা ভুলে এবার লজ্জায় যেন কুঁকড়ে গেল মহিমা। ওর সমস্ত মুখে আশ্চর্য এক রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়ছে। টিটো এবার

আলতো করে তার হাতখানা ধরে বলল, চল। একবার আমার মেসে চল। জায়গাটা ছেড়ে যাবার আগে শেষবারের মত বসে একবার আড্ডা দিয়ে যাই। আজ আবার অনেকদিন পর রজত এসেছে।

মহিমা যেন তার কথা শুনতে পাচ্ছে না। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। মুহূর্তে পেছন ফিরল টিটো। দেখল লাল টুকটুকে একটা ফিয়াট য়্যুনো থেকে রাজেন্দ্রানীর মত নেমে আসছেন রঞ্জা। তার ঠিক সামনে, পেছনে, রাস্তার উল্টোদিকের প্রায় সর্বত্র লাইটপোস্টের গায়ে সিনেমার বিজ্ঞাপনে' তারই ছবির সার। নিজের ছবির ভিড়ের মধ্যেই যেন নেমে এলেন রঞ্জা। দুর্দান্ত একখানা বালুচরী শাড়ি ত্বকের ওপর যেন আঠা দিয়ে সাঁটা শরীরের প্রতিটি বাঁককে প্রকট করে তুলেছে। শাড়িটা কিছুটা দূরত্বে রেখে তেজিয়'ান হরিণের মত বড় বড় পায়ে তাদের দিকে এগিয়ে এলেন রঞ্জা। টিটো টের পেল তার শরীর শক্ত হয়ে যাচ্ছে। রোমকূপ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় বেরিয়ে আসছে নোনা জল। কেমন এক রকমের আতঙ্ক এসে ঘিরে ধরল টিটোকে। রঞ্জার শরীরটা যেন ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। নাভির নীচে নামানো শাড়ির বাঁধনটা যেন ফাঁস হয়ে উঠে আসছিল চোখের সামনে।

রঞ্জা এসে মহিমার সামনে দাঁড়ালেন। তার পাশে ছোট্ট কোন মেয়ের মত দেখাল মহিমাকে। অল্প হেলে ডান হাতে তার থুতনিটা সামান্য তুলে ধরলেন রঞ্জা। শান্তভাবে তার চোখ দুটোয় কি যেন খুঁজলেন। তারপর শান্তভাবে টিটোকে বললেন, তোমাদের রেজিস্ট্রির খবরটা মোবাইল ফোনে পেলাম। রজতই দিল। তোমার সঙ্গে ওর যে আবার ভাব হয়ে গেছে শুনে ভালই লাগল। ভাবলাম, দিন তিনেকের ছুটি যখন আছে — যাই, তোমাদের সঙ্গে দেখা করেই আসি। তুমি যখন আমার ছেলের বন্ধু তখন আমারও তো কিছু কর্তব্য আছে —

টিটো অস্পষ্টভাবে বলল, রজতরা সকলে মেসে অপেক্ষা করে আছে।

কথাটা রঞ্জা যেন শুনতে পেলেন না। আঁচলের আড়াল থেকে সুদৃশ্য একটা ছোট কৌটো বের করে এনে টিটোদের সামনে তুলে ধরলেন। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ উজ্জ্বল কাচের আধারটা খুলে ধরতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের।

মটরদানার মত হিরে বসান দুলদুটো কৌটো থেকে বার করে সযত্নে মহিমাকে পরিয়ে দিলেন রঞ্জা।

রাস্তায় একটু একটু করে ভিড় বাড়ছে। রঞ্জাকে চিনতে পারছে সবাই। তবুও মহিমার স্নায়ুর প্রশংসা করতে ইচ্ছে হল টিটোর। দিব্যি মধুরভাবে দুলদুটো পরে নিল ও! গয়নার কী অসীম মহিমা ভাববার আগেই রঞ্জা টিটোর উদ্দেশ্যে বললেন, চাকরী পেয়েছ। এবার সুন্দরী বউও পেলে। আর কী? আর তোমাকেও বলি মেয়ে —

কথাটা থামিয়ে টিটোকে আলতো করে চোখ টিপলেন রঞ্জা। বললেন, কী প্রাইজ তুমি পেলে তুমি নিজেও জানো না। টিটোর মত ছেলে আমার ছেলের বন্ধুদের মধ্যে একজনও দেখলাম না।

খানিকটা তাড়াহুড়ো করেই যেন গাড়ির দিকে ফিরে চললেন রঞ্জা। মহিমার মনে হল, হয়ত কেঁদে ফেলতে পারেন এই ভয়েই বোধহয় ফিরে গেলেন মহিলা। তবে, এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটা তার খারাপ লাগেনি। রঞ্জার দিকে তাকিয়ে তার বলে যাওয়া কথাগুলো আরো একবার ভাববার চেষ্টা করল মহিমা। টিটো তখন রঞ্জার পেছন পেছন গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। শেষবারের মত রঞ্জার সঙ্গে কথা বলার লোভ সামলাতে পারছে না সে।

গাড়ির ভেতর ঢুকে স্টিয়ারিঙে হাত রাখে রঞ্জা। সীটের ওপর ফেলে রেখে যাওয়া রোদ চশমাটা তুলে নিয়ে পরে নেয়। ঠিক সেই মুহূর্তেই গাড়ির দরজাটা খুলে ধরে টিটো।

অপূর্ব ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখে রঞ্জা বললেন, কী হল?

— আপনি ..... তুমি কি চলে যাচ্ছ? প্রশ্নটা করার সময় একটু যেন কেঁপে উঠল টিটোর গলা।

—হ্যাঁ। এই শেষ। এরপর দুর্ঘটনা ছাড়া আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আর যখন মরব তখন অন্তত একবার দেখতে যাবে, এটুকু নিশ্চয়ই আশা করতে পারি?

টিটো বলল, তুমি যে মহিমাকে পছন্দ করেছ তাতে আমার খুব ভাল লেগেছে। তুমি যদি অনুষ্ঠানের দিন একটু সময় করে —

—নিজের বৌয়ের সামনে প্রাক্তনিকাদের ঘন ঘন আসতে নেই। তাতে কারোরই সম্মান থাকে না। যে ভাবেই হোক একদিন আমাদের ভিতর যে সম্পর্ক হয়েছিল তা তোমার কাছে আজ যতখানি অস্বস্তিকর আমার কাছে ঠিক ততটাই আনন্দের। বরং এখন আমি খোলাখুলি তোমাকে বলতে পারি, তোমায় আমি ভালবেসেছি। আমি পৃথিবী ঘেঁটে দেখেছি তবুও, বলতে আমার একটুও বাঁধছেনা, — তুমি আমার স্বপ্নের সবটুকু নিতে পারতে। কিন্তু, তুমি সেটা চাইলেনা। আমায় অ্যাভয়েড করতে থাকলে। যাবার আগে এটুকু বলি, জীবনের কিছু এখনও দেখনি। খুব তাড়াতাড়িই যদি ক্লান্ত হয়ে পড় জানবে আমার দরজা তোমার জন্য খোলা আছে।

এক রকম জোর করেই দরজাটা ভেতর থেকে টেনে বন্ধ করে গাড়িটা ছেড়ে দিলেন রঞ্জা! টিটোর নিজেকে বোকাটে মনে হলেও নিজেকে স্থির করে নিল। কেননা, এখনই ওকে গিয়ে বলতে হবে --- অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও ভদ্রমহিলা ওদের বিয়ের নেমন্তন্ন রাখতে আসতে পারবেন না বললেন। সামনেই ইন্দো-রাশিয়ান একটা ফিল্মের কাজে উনি বাইরে চলে যাচ্ছেন......... ইত্যাদি। টিটো জানে, এবারও তার কথা বিশ্বাস করবে মহিমা।